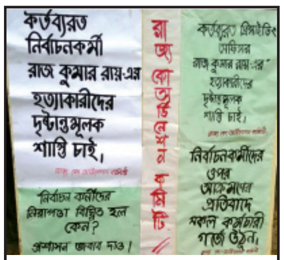

রাজ্যে গণতন্ত্রকে হত্যার বিরুদ্ধে সংগঠনের প্রতিবাদ

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

কাঠুয়া ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কাশ্মীরের আইনজীবীদের উদ্যোগে স্বাক্ষর সংগ্রহ

এপ্রিল '১৮ ■ ৪৬তম বর্ষ ■ দ্বাদশ সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

কর্মচারী ভবনে মে দিবস

১৮৮৬ সাল, ১ মে, আমেরিকার হে মার্কেটের আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে

রক্ত পতাকা উত্তোলন করছেন অসিত ভট্টাচার্য

লড়াই শুরু হলো ঘাম ঝরানো মেহনতি মানুষগুলোর। সেই সময়ের মালিকের পোষা দলদাস পুলিশের গুলিতে শ্রমিকের লাল রক্তে রাঙা হলো ঝাণ্ডা। সেই লাল ঝাণ্ডা নিয়ে দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষ বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এক সময় সোভিয়েতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। হিটলারের মতো ফ্যাসিস্ট শক্তিও লাল ঝাণ্ডার শক্তিকে শেষ করতে পারেনি, উল্টে রাইখস্টাগে লাল পতাকা উড্ডীন করেছিল অপরাজেয় লাল ফৌজ। তাই আমাদের দেশের তথা রাজ্যের শাসকশ্রেণী যতই চেষ্টা করুক লালঝাণ্ডা কাঁধে মানুষের অবিরাম পথ চলাকে বন্ধ করতে পারবে না।

ভারতের পুঁজিবাদী শক্তি ভয় পায় বামপন্থীদের, ভয় পায় বাম আন্দোলনকে, কারণ একমাত্র বামপন্থীরাই মেহনতি মানুষের কথা বলে, পুঁজিবাদীদের নয়, তাই বাম আন্দোলনকে স্তব্ধ করার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত চলছে সবসময়।

প্রবীর মুখার্জী

বিজয় শংকর সিংহ

শ্রেণী সংগ্রামের এই লড়াইতে সাময়িক বিপর্যয়ে লাল ঝাণ্ডার বিরোধী শক্তি উৎফুল্ল হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তাদের জেনে রাখা উচিত এই বিপর্যয় দীর্ঘকালীন নয়। শ্রমিক শ্রেণীর অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে একমাত্র লালঝাণ্ডাই। শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন মার্কসবাদ, মালিক শ্রেণীর কাছ থেকে অধিকার কেড়ে নিতে শ্রমিকের বুকের ভিতর স্পর্ধা জোগায় লাল ঝাণ্ডাই। তাই লালঝাণ্ডাকে হাতিয়ার করে মহান মে দিবসের শিক্ষাকে ধারণ করে আসুন আগামী লড়াইতে আমরা সকলে শামিল হই।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন

গত ৫-৮ এপ্রিল, ২০১৮, তামিলনাড়ু রাজ্যের চেন্নাই শহরে অনুষ্ঠিত হলো সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চেন্নাইয়ের মাধবরম অঞ্চলের রাম-লক্ষ্মী প্যারাডাইস হলে। এই উপলক্ষ্যে চেন্নাই শহরের নামকরণ করা হয়েছিল সুকোমল সেন নগর। শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন নেতৃত্ব প্রয়াত কমরেড সুকোমল সেন ছিলেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও মৃত্যুকালে সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান। সম্মেলন কক্ষের নামকরণ করা হয়েছিল মুথুসুন্দরম কক্ষ। প্রয়াত কমরেড মুথুসুন্দরম ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও মৃত্যুকালে চেয়ারম্যান। উত্তরে কাশ্মীর, উত্তর পূর্ব ভারতের ত্রিপুরা ও মণিপুর, দক্ষিণের কেরালা, পশ্চিমের মহারাষ্ট্র, পূর্ব ভারতের পশ্চিম বাংলা ও ওড়িশা সহ ২২টি রাজ্যের ২৭ টি সংগঠনের প্রায় সাড়ে ন'শ প্রতিনিধি এই জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। যাঁদের মধ্যে মহিলা প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য। চারদিনব্যাপী সম্মেলনে, সম্মেলন কক্ষটি যেন ক্ষুদ্র ভারতের প্রতিরূপ গ্রহণ করেছিল। কাশ্মীরের প্রতিনিধির বক্তব্যকে করতালি

চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সংগ্রামের ময়দানে থেকেই আটচল্লিশে পদার্পণ

আমাদের প্রিয় সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সমঝোতা মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার মে ২০১৮-তে সাতচল্লিশ বছর পূর্ণ করে আটচল্লিশে পা দিচ্ছে। যে কোনো সংগঠনের কাছেই তার মুখপত্রের এই দীর্ঘ পথ পেরিয়ে আসাটা আনন্দের এবং গর্বের। কিন্তু সংগ্রামী হাতিয়ারের কৃতিত্বটা অনন্য সাধারণ অন্য দিক দিয়ে। প্রথমত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি নামক রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের একমাত্র ভরসার সংগঠনটির মতনই জন্মলগ্ন থেকেই শাসকশ্রেণীর হাতে আক্রান্ত হয়েছে সংগ্রামী হাতিয়ারও। সংগ্রামী হাতিয়ারের জন্ম হয়েছিল বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে, ১৯৭১ সালে। দ্বিতীয়ত বামপন্থী মতাদর্শকে বুকে আগলে রেখে এই পত্রিকা লাগাতার প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সাতচল্লিশ বছর ধরে, বিশেষত ভারতে নয়া উদার অর্থনীতির প্রায় আড়াই দশক জুড়ে যখন গোটা দেশ তথা আমাদের রাজ্যে বাম মতাদর্শ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে, তখন একবারের জন্যও আত্মসমর্পণ করেনি সংগ্রামী হাতিয়ার। তৃতীয়ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আদর্শ অনুযায়ী কর্মচারী স্বার্থকেই সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিয়ে বরাবর প্রকাশিত হয়ে চলেছে এই পত্রিকা। এক্ষেত্রেও কোনো সমঝোতা কখনও করেনি সংগ্রামী হাতিয়ার।

সুতরাং সংগ্রামী হাতিয়ারের সাথে আর পাঁচটা পত্রিকাকে এক করে দেখা যাবে না। কণ্টকাবৃত প্রতিকূল পথে প্রতিনিয়ত হেঁটে হেঁটে সাতচল্লিশ পেরিয়ে আটচল্লিশে পা দিয়েছে সংগ্রামী হাতিয়ার। এটা সন্দেহাতীত ভাবেই গর্বের বিষয়, আনন্দের বিষয়। এই কৃতিত্বের শরিক সংগঠনের নেতৃত্ব-কর্মী বা পত্রিকার সাথে যুক্ত সকলেই শুধু নন, এর শরিক সংগঠনের অনুগামী সকল কর্মচারীবৃন্দ, বিশেষত পত্রিকার গ্রাহককূল। যাঁরা পত্রিকার চলার পথে প্রতিনিয়ত জুগিয়েছেন রসদ, যাঁদের সমালোচনা ও উৎসাহে পত্রিকা ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়েছে। সে কারণেই সকল কর্মচারী ও গ্রাহককে সংগ্রামী হাতিয়ার-এর এই অনবদ্য কৃতিত্ব নির্মাণের জন্য সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। পত্রিকা প্রকাশনা ও রাজ্য ব্যাপী বণ্টনের সাথে যুক্ত সকল কর্মীকেও উষ্ণ অভিনন্দন জানাই প্রাক্ সুবর্ণজয়ন্তীর এই গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে।

সংগঠন ও তার মুখপত্র কখনোই আলাদা সত্ত্বা হিসেবে বিকশিত হয় না। বরং এই প্রবণতা উভয়ের বিকাশের পক্ষেই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। লেনিনের কথা অনুযায়ী মুখপত্র যৌথ প্রচারকই শুধু নয়, যৌথ সংগঠকও। সংগ্রামী হাতিয়ার শুধু সংগঠনের কর্ম প্রক্রিয়ার প্রচারের কাজ করেই তুষ্ট থাকতে পারে না, যৌথ সংগঠকের

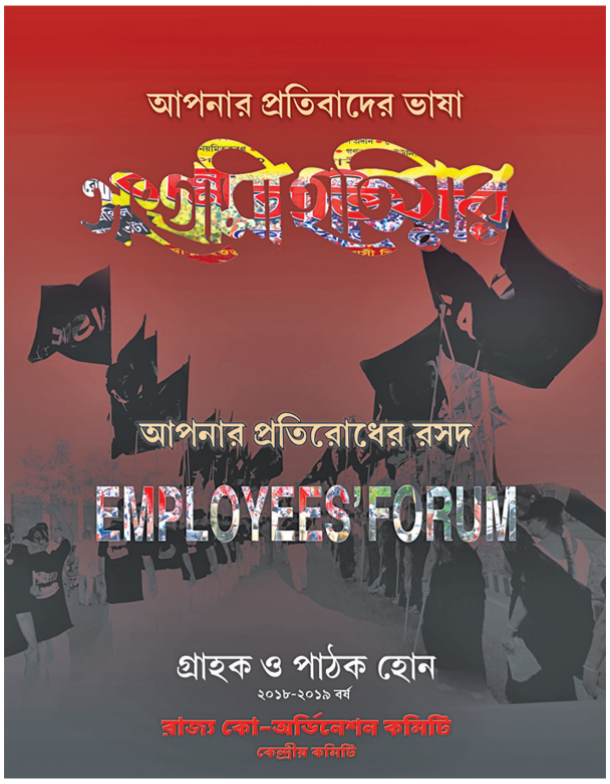

কাজেও সে যথাযোগ্য ভূমিকা প্রতিপালনে ব্রতী। বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকের তমসাঘন সময়, সংগঠন আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক বামফ্রন্ট সরকারের চৌত্রিশ বছরের সময়কাল এবং ২০১১ থেকে এই সময় পর্যন্ত অত্যন্ত প্রতিকূল সময়—এই বিভিন্ন সময়পর্বে পত্রিকার মূল মর্মবস্তু কখনও হারিয়ে যায়নি। সময়ের সাথে সাথে সংগঠনের কর্মপ্রক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই যেমন পরিবর্তিত হয়েছে, তার মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ারও তার বহিরঙ্গে কিছু পরিবর্তন সময়ের সাথে তাল মিলিয়েই ঘটিয়েছে। একই সাথে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি যেমন শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শের প্রতি তার আস্থা থেকে কখনও সরে যায়নি, সংগ্রামী হাতিয়ারও সেই মতাদর্শকে তার অন্তর্বস্তুগত উপাদানের মূল ভিত্তি হিসাবেই আগলে রেখেছে। এই কাজ অত্যন্ত কঠিন। সেই কঠিন কাজই নিরলসভাবে করে চলেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। নয়া উদার অর্থনীতির আক্রমণ, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদের আক্রমণ, কর্মচারীদের অধিকারের উপর আক্রমণ, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ—সব কিছুর বিরুদ্ধেই আপসহীন ভাবে সোচ্চার আমাদের সংগ্রামী হাতিয়ার।

নয়া উদার অর্থনীতির প্রয়োগ বিগত আড়াই-দশকের বেশি সময় ধরে আমাদের দেশে চলছে। এই অর্থনীতির একটি অনুসারী সংস্কৃতি আছে। তার প্রভাব বিশেষত মধ্যবিত্তের উপর প্রবল। এই সংস্কৃতির হাত ধরে যেমন সবকিছুর পণ্যায়ন হচ্ছে, আবার এই সংস্কৃতির দ্বারাই খুব সচেতনভাবেই বিরাজনীতিকরণ ঘটানো হচ্ছেন সবকিছুর। এর দ্বারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে আমাদের একটা অংশ। ট্রেড ইউনিয়ন করে, আন্দোলন করে, ধর্মঘট করে কিছু হবে না, তার চেয়ে নিজেকে দেখ, নিজের পরিবারকে দেখ—এই প্রচার চালানো হচ্ছে অত্যন্ত সুচতুর ভাবে। এই প্রচার মধ্যবিত্তদের একাংশকে প্রভাবিত করছে এটা বিভিন্ন গবেষণাই বলছে। তার উপর প্রথাগত মধ্যবিত্তের জায়গা দখল করে নিচ্ছে তথাকথিত নব্য মধ্যবিত্ত (আমাদের প্রায় প্রত্যেকের পরিবারে এই অংশ আছে), যারা বিশ্বায়ন তথা উদারনীতির সমর্থক হয়ে যাচ্ছে নানাবিধ কারণে। এই জটিল ও কঠিন পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সংগঠিত করে জঙ্গী আন্দোলনে যাওয়ার মতো দুরূহ কাজ করে চলেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তাকে যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে সংগ্রামী হাতিয়ার।

এই মুহূর্তে গোটা দেশ তথা রাজ্য জুড়ে সাম্প্রদায়িক শক্তি প্রবলভাবে সক্রিয়। কেন্দ্রে হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্ত ধর্মী সংগঠন আর এস এস-এর রাজনৈতিক শাখা বিজেপি ক্ষমতাসীন। আমাদের রাজ্যেও এরা ক্রমশ সক্রিয় হচ্ছে। এ রাজ্যেও দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে। রাজ্যের শাসকদলের প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতায় মদত পাচ্ছে মৌলবাদী শক্তিগুলি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে ঐতিহ্য রাজ্যের ছিল তা আজ ভূলুণ্ঠিত। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির জন্য ষড়যন্ত্র অব্যাহত আছে। কিন্তু রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও তার মুখপত্র সজাগ পাহারাদার হিসেবে রয়েছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ঐক্য বিনষ্ট যাতে না হয় তার জন্য সদা সচেতন সংগ্রামী হাতিয়ার। কর্মচারীদের মগজ ধোলাই করার হীন প্রয়াস নিচ্ছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। একে

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সম্পাদকীয়

পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবীদের প্রতি

খুব মনে পড়ে যাচ্ছেে ২০০৮, ২০০৯, ২০১০-এর পশ্চিমবাংলার কথা। চোখ মেললেই দেখা যাচ্ছিল, কান পাতলেই শোনা যাচ্ছিল এক জোড়া শব্দের একটি ছোট্ট বাক্য—'পরিবর্তন চাই।' কী পরিবর্তন চাই? রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন চাই। এতদিন যারা রাজ্যে শাসনপাট চালিয়েছে তাদের নাকি বিদায় করতেই হবে। কারা বলছিলেন একথা? অনেকেই, বা বলা ভালো বহু মানুষ বলেছিলেন একথা। কেউ সকাল-সন্ধ্যেয় টিভি-র 'টক শো'-তে সেজেগুজে বসে, কেউ রাস্তার দু-ধারে বড় বড় হোর্ডিংয়ে নিজের ছবি আর স্বাক্ষর দিয়ে, কেউ বা রাস্তার মোড়ে মোড়ে মাইক বাজিয়ে বা ধর্মতলার মঞ্চ আলো করে, এক নাগাড়ে বলেই চলেছিলেন ঐ একটাই বাক্য। যেমন করেই হোক পরিবর্তন নাকি আনতেই হবে। 'কারা বলছিলেন'-এর পরে আসে দ্বিতীয় প্রশ্ন—কেন বলছিলেন? হঠাৎ করে নাওয়া-খাওয়া ভুলে বিভিন্ন রংয়ের জামা গায়ে দিয়ে, গলাগলি করে সমস্বরে পরিবর্তন-সঙ্কীর্তন শুরু হলো কেন? বড় কারণ বা বলা ভালো মূল কারণ তো একটা ছিল বটেই, কিন্তু তাকে আড়ালে রাখা হয়েছিল। সামনে ভিন্ন ভিন্ন কারণ আর ব্যাখ্যা। নরমে গরমে রং চড়িয়ে এই কারণ আর ব্যাখ্যাগুলিকে বাজারে ছাড়া হয়েছিল। কেউ বলেছিলেন, গণতন্ত্রে ভাই একটি দল বা জোটের টানা শাসন ভালো নয়। নিয়মিত পরিবর্তন হলেই না কী গণতন্ত্র বাঁচে! যাঁরা এই কথাগুলি বলেছিলেন, তাঁদের যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রশাসন পরিচালনায় শুধু দল বা জোটের পরিবর্তন হলেই কি গণতন্ত্র বাঁচবে? নীতি বা প্রশাসন পরিচালনা পদ্ধতি জরুরী বিষয় নয়? কেন্দ্রে বা বিভিন্ন রাজ্যে তো ঘন ঘন পরিবর্তন হয়। তাতে সাধারণ মানুষের লাভ হয় কি? নীতির কোনো পরিবর্তন হয় কি? না, এই প্রশ্নগুলির কোনো জবাব তাঁরা দেননি। আসলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর তাঁদের জানা ছিল না, তা নয়। জানা ছিল, কিন্তু জানা থাকা সত্ত্বেও এই অপ্রিয় প্রশ্নগুলির উত্তর তাঁরা দিতে চাননি। কারণ নীতি নিয়ে আলোচনা শুরু হলে বামফ্রন্টের বিকল্প হিসেবে যে শক্তিকে 'প্রজেক্ট' করা হচ্ছিল, তাদের নীতি কী, তা নিয়ে আলোচনা-বিতর্ক শুরু হতো ও এক নীতিহীনতার বেড়াল ঝুলি থেকে বেরিয়ে পড়ত। পরিবর্তন পন্থী আরও এক অংশ ছিলেন, যাঁরা আবার কিছুটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে রাজনীতির রঙ মিশিয়ে 'সিঙ্গুর', 'নন্দীগ্রাম' প্রসঙ্গকে হাতিয়ার করেছিলেন। কৃষক দরদে বুক ভাসিয়ে বামেরা কেমন কৃষক-বিরোধী হয়ে পড়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য প্রচারের ঝড় তোলা হয়েছিল। যা প্রকৃত ঘটনা, বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে যা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাকে আড়াল করে সত্য মিথ্যা মেশানো এক অদ্ভুত প্রচারের ঝড় উঠেছিল গোটা রাজ্য জুড়েই। সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম কখনোই একই অবস্থানে ছিল না। সিঙ্গুরে একটি শিল্পের নির্মাণ কাজ প্রায় আশি শতাংশ সম্পন্ন হয়েছিল, আর নন্দীগ্রামে কোনো কাজ শুরুই হয়নি। অথচ 'পোস্ট ট্রুথ'-এর দাপটে সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছিল।

নরম-গরম উভয় প্রচারকেই মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের বড় অংশ। এমনকি অপপ্রচারের কনসার্টকে আরও জোরদার করার জন্য বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র ও দু-একটি টিভি চ্যানেল ভুঁইফোড়ের মতো বাজারে আবির্ভূতও হয়েছিল। পরে অবশ্য জানা যায় ঐ সমস্ত সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলের মালিক হলেন জনগণের টাকা লোপাট করা কয়েকটি চিট ফান্ডের কর্তাব্যক্তিরা। এক কথায় যে কোনো মূল্যে বামফ্রন্টকে সরানোর জন্য কলকাতার কালীঘাট থেকে কালিম্পং-এর ডেলো পাহাড় পর্যন্ত (ভায়া জঙ্গলমহল) তৎপরতা শুরু হয়েছিল বিস্তর। বলা বাহুল্য ফলও তাঁরা পেয়েছিলেন। ৩৪ বছর পর বামফ্রন্ট সরকার চলে গেছিল।

কিন্তু পরিবর্তনপন্থীরা যাঁদের ক্ষমতায় বসাতে চেয়েছিলেন, তাঁরা ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতা কী? বুদ্ধিজীবী মহল, যাঁরা বাম জমানার 'দুঃশাসন' থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্ত করার জন্য বক্তৃতায়, গানে, কবিতায়, নাটকে আসর জমিয়ে তুলেছিলেন, তাঁদেরই বা অভিজ্ঞতা কী? যাঁরা পরিবর্তন-উত্তর রাজ্যপাটের মধুভাণ্ড চেখে দেখার সুযোগ পেয়েছেন এবং এখনও পাচ্ছেন, তাঁদের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। কারণ তাঁরা যা চেয়েছিলেন, তা তাঁরা পেয়েছেন। ফলে গোটা রাজ্য রসাতলে গেলেও তাঁদের কিছুই আসে যায় না। একটি গভীর চক্রান্তের 'কুশীলব' হিসেবে তাঁরা দক্ষতার সাথে তাঁদের ভূমিকা পালন করেছিলেন বলেই পুরস্কৃতও হয়েছেন, হচ্ছেনও। কিন্তু যাঁরা এই গেম প্ল্যানের অংশ ছিলেন না, হয়তো বা বিচ্ছিন্ন কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে 'পরিবর্তন'-এর হাওয়াটাকে 'সুবাতাস' বলে ভ্রম হয়েছিল, আজকে তাঁদের অভিজ্ঞতা কী? অস্ফুটে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, কিন্তু অনেকেই এখনও চুপ। কেন?

অভাবের তাড়নায় কৃষকের আত্মহত্যা করার অবাধ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, গত সাত বছরে এই রাজ্যে। এটা ঠিক, বাম শাসনের ৩৪ বছরে 'আত্মহত্যা'-র স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ বা প্রয়োজন কোনোটাই ছিল না কৃষকের কাছে। এই গণতন্ত্র কি সাধারণ মানুষ চেয়েছিলেন? বুদ্ধিজীবী মহল, যাঁরা কোনো প্রলোভনে নয়, নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা অনুভূতির ভিত্তিতে পরিবর্তন চেয়েছিলেন, তাঁদের আজকে অভিমত কী? জানতে ইচ্ছে করে।

'শিল্প'ক্ষেত্রে শ্মশানের নিস্তব্ধতা, নতুন শিল্প নেই, চালু শিল্প তোলাবাজির ধাক্কায় পাততাড়ি গুটিয়েছে। রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়নি। কর্মহীন যুবক-যুবতীদের কাছে শুধু হতাশার অন্ধকার। এমন পরিবর্তনের জন্যই কি দামামা বাজানো হয়েছিল? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন তেলেভাজার দোকান করার কথা বলে রাজ্যের কর্মপ্রার্থীদের সাথে মস্করা করেন বা ৮১ লক্ষ কর্মসংস্থানের মতন হাস্যকর তথ্য হাজির করেন, তখন কি মনে হয় আপনাদের? জানতে ইচ্ছে করে।

যখন তথাকথিত কোনো ছাত্র নেতা সম্মানীয় কোনো অধ্যাপকের গালে থাপ্পড় মারে বা শুধুমাত্র অষ্টমশ্রেণী উত্তীর্ণ কোনো সমাজবিরোধী স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্য হওয়ার সুযোগ পায় ও সেই সুবাদে শিক্ষিকার কপাল লক্ষ্য করে জলের জগ ছুঁড়ে মারে, তখন এই আঘাত তো আসলে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার গায়ে লাগে—তাই না?

যে পরিবর্তন আনার জন্য কাঠ-খড় পোড়ানো হয়েছিল, সেই পরিবর্তন আমাদের মা-বোনেদের চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। সমাজের অগ্রগতির অন্যতম নিরিখ হলো নারীদের ক্ষমতায়ন। নারীদের ক্ষমতায়ন মানে ঘরের বাইরে, তাদের পা রাখতেই হবে। কিন্তু এ রাজ্যে এখন নারীরা ঘরের বাইরে পা রাখলেই কিছু লোলুপ হায়নার চোখ নারী শরীরে সার্চ লাইটের মতন পড়তে থাকে। আরো বিস্ময়কর হলো এই লোভাতুর দৃষ্টিগুলি শুধু রাতের অন্ধকারেই নয়, দিনের আলোতেও ঘোরাফেরা করে। কারণ ওরা নির্ভয়। কারণ ওরা জানে, এই রাজ্যের আইনে ধর্ষকের নয়, ধর্ষিতার শাস্তি হয়। বড় জানতে ইচ্ছে করে কী বলছেন তারা যাঁরা এ রাজ্যে পরিবর্তনের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলেন?

সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রশ্ন। খুব পিছনে না গিয়ে শুধুমাত্র সদ্যসমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গোটা পর্বটার দিকে তাকান। বুঝতে অসুবিধা হবে না তাঁদের, গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য পরিবর্তন জরুরি বলে যাঁরা তত্ত্ব আউড়েছিলেন। প্রহসনের নির্বাচন বললেও সবটা বোঝানো যাবে না। ভোটের দিন বুথ দখল করে ছাপ্পা ভোট—শুধু এতটুকু হলে যারা পরিবর্তনের পক্ষে গলা চড়িয়েছিল, এখন মৌন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলে উঠতেন, কেন আগে হয়নি? অমুক জেলার, অমুক ব্লকে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এবারের পঞ্চায়েতে যা হলো, গণনার দিনেও ব্যালটে ছাপ্পা মারা, বিরোধী দলের সমর্থক হওয়ার অপরাধে(!) জীবন্ত পুড়িয়ে মারা— এ রাজ্যে, এ দেশ তো ছেড়ে দিন, গোটা পৃথিবীতেও এমন নজির আছে? কাকদ্বীপে যে দম্পতিকে রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে মারা হলো, যাদের দগ্ধ দেহ দুটিকে সন্তানের হাতে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না, কই সেই পিতৃ-মাতৃহারা সন্তানের পাশে মোমবাতি জ্বালিয়ে দাঁড়ানোর জন্য তাঁদের কাউকে তো এগিয়ে আসতে দেখা গেল না, একসময় পরিবর্তনের কোরাস তুলে যাঁরা ঘনঘন রাস্তায় নামতেন, আর মোমবাতি মিছিল করতেন?

আসলে ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়েছিল অন্য লক্ষ্য নিয়ে। নবজাগরণের ঐতিহ্যবাহী ও বাম আন্দোলনের অগ্রবর্তী এই ঘাঁটি রাজ্যটিকে প্রতিক্রিয়ার আস্তাকুড়ে পরিণত করা ছিল লক্ষ্য। কারণ এ রাজ্যে বামপন্থীদের শক্তি হ্রাস পেলে সারা দেশজুড়েই বামপন্থীরা দুর্বল হবে। আর বামপন্থীরা দুর্বল হলে নয়া উদারবাদী অর্থনীতি-বিরোধী আন্দোলনটাই দুর্বল হবে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক লগ্নি পুঁজি ও কর্পোরেট পুঁজির যা খুশি করার রাস্তা সুগম হবে। এমনকি প্রয়োজনে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রক্ষমতায় একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বসানোর কাজটাও। ২০১১-র পরেই তো ২০১৪ সালে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ফলে যারা এ রাজ্যে পরিবর্তনের স্লোগান তুলেছিলেন, তারা আসলে জেনে অথবা না জেনে সারা দেশে অস্থিরতার আবাহনই করেছিলেন। দায়টা তাঁরা এড়াতে পারেননা। এখন দেখার, কোন মানসিক যন্ত্রণা তাঁদের সংশোধনের রাস্তায় ঠেলে দেয় কিনা? □

১৮ মে, ২০১৮

জীবনাবসান
ডঃ অশোক মিত্র

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রের জীবনাবসান ঘটে গত ১ মে ২০১৮, নব্বই বছর বয়সে। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। তাঁর স্ত্রী গৌরী দেবী বেশ কয়েক বছর আগেই প্রয়াত হয়েছেন।

১৯২৮ সালের ১০ এপ্রিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে অশোক মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সালে আই এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ১৯৪৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সাম্মানিক স্নাতক হন। এই পরীক্ষাতে তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। ১৯৪৯ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। কর্মজীবনের শুরুতে নেদারল্যান্ডসের ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ-এ শিক্ষকতা করেন। ১৯৫৩ সালে তিনি ইনস্টিটিউট অফ রটারডাম থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটে কাজ করেন। ১৯৭০ সালে হন ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা। ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করার পরবর্তীতে কৃষিপণ্য মূল্য নির্ধারণ কমিশনেরও চেয়ারম্যান হন। কিছুদিন লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯৭৭ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের নির্বাচনে বিধানসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৮২ সালে পুনর্নির্বাচিত দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারেরও অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এই সময় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে গঠিত শিক্ষা কমিশন, প্রশাসনিক সংস্কার কমিটিরও চেয়ারম্যান হন।

ডঃ অশোক মিত্র নেদারল্যান্ডের রটারডামে পিএইচডি করেন নোবল জয়ী বামপন্থী অর্থনীতিবিদ জন টিমবারগেনের তত্ত্বাবধানে। তাঁর গবেষণা পত্রের বিষয় ছিল একটি আদর্শ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় যখন মজুরি বৃদ্ধির হারের তুলনায় মূল্যবৃদ্ধির হার বেশী হয়, অর্থাৎ পুঁজিপতিরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে, তখনও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুঁজিপতিরা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে কেন? প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মাইকেল কেলেস্কিও এই প্রশ্নটিকে নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন। প্রশ্নটির উত্তর দেন ডঃ অশোক মিত্র। তাঁর অনুসন্ধানলব্ধ উত্তর ছিল ঃ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন সমগ্র বাজার কাঠামোটিকেই প্রভাবিত করে। তাঁর এই ব্যাখ্যা তাঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে এই তত্ত্বটির নামকরণ হয় 'কেলেস্কি-মিত্র বণ্টন তত্ত্ব'।

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে ডঃ মিত্র-র গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল ভূমি সংস্কার কর্মসূচীতে। নথিভুক্ত বর্গাদারেরা যখন উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট অংশ জোতদারদের দিতেন, তার বিনিময়ে জোতদারেরা রসিদ দিতেন বর্গাদারদের। এই রসিদ ছিল জমির ওপর টেন্যান্ট হিসেবে বর্গাদারের অধিকারের প্রমাণ। যে রসিদ দেখিয়ে ব্যাঙ্কঋণ পেতে পারতেন বর্গাদারেরা। গ্রাম বাংলার শ্রেণীশক্তির পারস্পরিক ভারসাম্য পরিবর্তনে এই সিদ্ধান্ত ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৭২-৭৭ পশ্চিমবাংলার আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের কালে 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইক্লিতে' তাঁর ধারাবাহিক নিবন্ধ 'ক্যালকাটা ডায়েরি' বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতেই তাঁর রচনাশৈলী ছিল অসাধারণ। তাঁর লেখা কয়েকটি বিখ্যাত বই হল, 'তাল বেতাল', 'কবিতা থেকে মিছিলে', 'আপিলা চাপিলা' প্রভৃতি। 'তাল বেতাল' বইটির জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পান।

সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন কর্মসূচীতে প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ অশোক মিত্র। □

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনের প্রাক্তন নেতৃত্ব এবং শিক্ষক কর্মচারী শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম আহ্বায়ক শিশির ভট্টাচার্য। তাঁর প্রয়াণে ১২ই জুলাই কমিটি, কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারীদের কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে শোক জ্ঞাপন করা হয়।

রক্তদান কর্মসূচী

রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটি, কলকাতা পূর্বাঞ্চলের উদ্যোগে রক্তদানের কর্মসূচী সাফল্যের সাথে প্রতিফলিত হলো ১৭ অক্টোবর, ২০১৭, বেলেঘাটার বাণিজ্যকর দপ্তরের ক্যান্টিন হলে। ২ জন মহিলাসহ মোট ৫০ জন কর্মচারী রক্তদান করেছেন। রক্তদানের কর্মসূচীটি উদ্বোধন করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য ও সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন পূর্বাঞ্চলের সম্পাদক দেব শঙ্কর সিনহা। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করে বক্তব্য রাখেন বাণিজ্য কর দপ্তরের অতিরিক্ত মহাধ্যক্ষ শ্রী সুব্রত চৌধুরী মহাশয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সৌমিত্র পাত্র।

ঐ সময়কালে রাজ্যে ডেঙ্গুসহ অন্যান্য রোগ মহামারির আকার নিয়ে ছিল। ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের অপ্রতুলতায় মুমূর্ষু রোগীর চিকিৎসা অসম্ভব হয়ে উঠে ছিল। এই পরিস্থিতিকে মাথায় রেখেই সরকারী কর্মচারীদের সংগঠন রাজ্য কো অর্ডিনেশন কমিটি বিভিন্ন স্তরে রক্তদানের কর্মসূচী প্রতিপালনের আহ্বান জানায়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐ দিনের কর্মসূচীতে কর্মচারীদের বিপুল উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। □

লাফিয়ে বাড়ছে তেলের দাম

কর্ণাটকের ভোট মিটতেই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে তেলের দাম। তেলের দাম মেটাতে গাড়ি বিক্রির অবস্থা মালিকদের। তেল সংস্থার খবর আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দাম বাড়তে পারে গড়ে চার টাকা বা তারও খানিকটা বেশি।

কর্ণাটক ভোটের আগে বেশ কিছুদিন তেলের দাম বাড়েনি। সে সময় বিশ্ব বাজারে তেলের দাম চড়েছে। বাজারে তেলের দাম এক জায়গায় থাকায় সে সময় তেল কোম্পানিগুলির লাভের পরিমাণ ৫০-৭০ পয়সায় নেমে যায়। আমদানি খরচ অনুযায়ি সাধারণভাবে তা ২.৭০ টাকা হওয়ার কথা। ঐ লাভ পোষাতে আগামী দিনে পেট্রোলের দাম লিটারে ৪ থেকে ৪.৫৫ টাকা এবং ডিজেলে ৩.৫ টাকা থেকে ৪ টাকা পর্যন্ত বাড়তে পারে। প্রথম ধাপে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে ২৮ ও ৩০ পয়সা। ডিজেলের দাম রোজই নজির গড়ছে।

এদিকে তেলের দাম বাড়ানো নিয়ে বিরোধীরা অনবরত মোদি সরকারের সমালোচনা করছে। সবারই দাবি সরকার ক্রেতাদের সুবিধা দিতে উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করুক। কিন্তু বিজেপি সরকার তেলের এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখাচ্ছে না। এর ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠা আরও বাড়ছে। কেননা এর ফলে পণ্যমূল্যও বেড়ে যাবে। □

ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন

নীতি ও কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাব

দেশ ও জনস্বার্থ বিরোধী নয়া উদারবাদী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্রতর কর এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলো—

১৯৯০ পরবর্তী পর্বে কংগ্রেস সরকারের পক্ষ থেকে যে নয়া-উদারবাদী অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছিল, তা এযাবৎকাল অনুসৃত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাতিল করে দিয়েছিল। এন ডি এ সরকার পূর্বসূরী ইউ পি এ সরকারের প্রদর্শিত পথেই, লগ্নীপুঁজিকে তোষামোদ করতে আরও দ্রুত গততে এগিয়ে চলেছে। উন্নয়নের অছিলায় গৃহীত উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়নের নীতির সর্বাধিক ক্ষতিকর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে গ্রাম ভারতে। বর্তমানে চালু অর্থনৈতিক নীতিসমূহ সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে দুর্দশা ও অবনমনের মুখে দাঁড় করিয়েছে, যার সর্বাধিক শিকার হচ্ছেন শ্রমজীবী জনগণ। দেশে অসাম্যের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ শ্রমজীবীদের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদ গুটিকয় বৃহৎ কর্পোরেট ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হচ্ছে।

কৃষি ক্ষেত্র কার্যত ধ্বংসের মুখে। কৃষি সঙ্কট বৃদ্ধি পাওয়ার পরিণতিতে, দুর্দশার কারণে আত্মহত্যা ধারাবাহিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। নয়া উদারবাদী সংস্কার নীতির শুরু থেকেই কর্মহীনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, যা বর্তমান সময়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ভারতীয় জনগণের ক্রয়ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা সঙ্কুচিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার ওপর নিষ্ঠুর আক্রমণ এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ হ্রাসের ঘটনা ক্রমবর্ধমান।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ক্রমাগত হ্রাস পেলেও, দেশের অভ্যন্তরে সরকার জ্বালানির দাম বারংবার বৃদ্ধি করেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, সরকার সর্বজনন গণবণ্টন ব্যবস্থাকে তুলে দিতে চাইছে। দেশীয় অর্থনীতির সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিই এখন প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত। প্রতিরক্ষা, বীমা, রেল ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগকে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত এবং সম্পূর্ণ বেসরকারীকরণের লক্ষ্যে তেল ও আর্থিক প্রতিষান সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের শেয়ার বিক্রীর সিদ্ধান্ত দেশের অর্থনীতি ও দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বিপর্যয়কর প্রভাব সৃষ্টি করবে। নয়া উদারবাদী নতি ও বেসরকারীকরণের প্রক্রিয়াকে জোরদার করার ফলে দুর্নীতি ও লুটের সুযোগ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

নয়া উদারবাদী নীতি দেশের সরকারী প্রশাসনকেও গভীর সঙ্কটে ঠেলে দিয়েছে। সাধারণ মানুষের জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণে সরকারী পরিষেবার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকারের পক্ষ থেকে এই পরিষেবা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সমাজের অগ্রগতির সাথে তাল রেখে সরকারী পরিষেবারও সম্প্রসারণ ঘটানো উচিত। কিন্তু নয়া উদারবাদী নীতির নির্দেশ হল, সরকার সমস্ত ক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেবে। ফলে সরকারী পরিষবারও কাট-ছাঁট হচ্ছে। সরকারী প্রশাসনে লক্ষ লক্ষ পদ শূন্য রাখা হয়েছে যার ফলে কর্মরত কর্মচারীদের ওপর বিপুল কাজের বোঝা চাপছে।

সংজ্ঞায়িত পেনশন ব্যবস্থার পরিবর্তে আপত্তিকর পি এফ আর ডি এ আইনের মাধ্যমে পেনশন ফান্ডের বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। শ্রমিক কর্মচারীদের পেনশন পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই।

শ্রমিক-কর্মচারীদের মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারগুলিও আক্রান্ত। সমস্ত শ্রম আইনের সংশোধন করতে এনডিএ সরকার ব্যস্ত। লক্ষ্য হল মালিকপক্ষকে 'হায়ার অ্যান্ড ফায়ার'-এর নির্বিচার ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ করে দেওয়া এবং শ্রমিক-কর্মচারী ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।

স্থায়ী নিয়োগের পরিবর্তে সময় ভিত্তিক নিয়োগের সিদ্ধান্তের লক্ষ্যই হল শ্রমিক-কর্মচারীদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে কর্পোরেটদের করুণার পাত্র করে তোলা। বেতন সংশোধনের প্রশ্নে রাজ্যগুলির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। অধিকাংশ রাজ্য ১০ বছর অন্তর বেতন সংশোধন পদ্ধতি অনুসরণ করছে। রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বেতন পাঁচ বছর অন্তর সংশোধন করা প্রয়োজন। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন এবং রাজ্যগুলি যাতে কর্মচারীদের বেতন সংশোধন করতে পারে তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ করতে হবে। সরকার করযোগ্য আয়ের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা না করে শ্রমিক-কর্মচারীদের পোষণ করছে।

শ্রমিক শ্রেণী ও সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ও অধিকারের ওপর শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে ক্রমবর্ধমান আক্রমণ নামিয়ে আনার ফলে, শ্রমিক শ্রেণীকে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এই বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে শ্রমিক শ্রেণী ও সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে নয়া উদার নীতিকে প্রতিরোধ করতে হবে। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া মিথ্যা প্রচারের বন্যায় মানুষকে বিভ্রান্ত করে নয়া উদারনীতি বিরোধী লড়াইকে দুর্বল করছে।

শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে সমস্ত ধরনের আক্রমণ নামিয়ে আনা হলেও শ্রমিক শ্রেণী সহ শ্রমজীবী মানুষ প্রমাণ করেছেন দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে ঐ আক্রমণগুলিকে প্রতিহত করতে তাঁরা সক্ষম।

এই লড়াইকে দুর্বল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মীয় ভাবাবেগকে ব্যবহার করছে। সমাজকে পঙ্গু করার সমস্ত অভিসন্ধিমূলক পদ্ধতি তারা গ্রহণ করছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক প্রচারর মধ্য দিয়ে তারা একদিকে মানুষকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করছে, এবং অপর দিকে মানুষের জীবন ও জীবিকার লড়াই থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে চাইছে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ আজ বিপদাপন্ন ও এন ডি এ সরকার তার মৌলবাদী চিন্তাকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে দুর্বল করছে। সংঘ পরিবার তাদের নিজস্ব কর্মসূচীকে শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতামূলক আক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দলিত ও অন্যান্য সামাজিক অনগ্রসর অংশের উপর আক্রমণ তীব্রতর হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে মুক্ত চিন্তাকে দমিয়ে দেবার প্রচেষ্টা ও মানুষের সাংবিধানিক অধিকারের ওপর আক্রমণকে প্রতিহত ও পরাস্ত করতে হয়।

সাম্প্রদায়িক প্রচারের সঙ্গী হয়েছে ইতিহাসের পরিবর্তে পুরাণ ও দর্শনের পরিবর্তে অধিবিদ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা। পাঠ্যসূচী ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে এই কাজ করার চেষ্টা হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক ভাবনা আজ আক্রান্ত। প্রধানমন্ত্রী নিজেই অপবিজ্ঞান ও অবাস্তব ধারণাকে প্রচার করছেন। সাম্প্রদায়িকতা ঐক্যের পরিপন্থী। কয়েক দশকের ঐক্যবদ্ধ লড়াই যে সংহতি তৈরি করেছে, তাকে ধ্বংস করছে সাম্প্রদায়িকতা। নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা ও তাকে শক্তিশালী করার কাজে বাধা দেয় সাম্প্রদায়িকতা। তাই ধর্ম, ভাষা, জাত পাত, অঞ্চল ইত্যাদি যে কোনো ভিত্তিতেই বিভাজনের অপচেষ্টা হলে তাকে রুখে দেওয়া শ্রমজীবীদের একান্ত কর্তব্য। ঐক্যবদ্ধ লড়াইকে জারি রাখা। শ্রমজীবীদের ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলে একই সাথে নয়া উদারনীতি, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইকে জারি রাখতে হবে।

এই সম্মেলন ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার ও সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদবিরোধী লড়াই হয়ে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের শামিল করার শপথ গ্রহণ করছে।

ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন রাজ্য সরকারী কর্মচারী সহ সমস্ত অংশের শ্রমজীবী মানুষের কাছে দেশ ও জনগণের স্বার্থে নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দালন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছে। □

ত্রিপুরার সংগ্রামী জনগণের প্রতি সংহতি

অতীতের ইতিহাস ছাড়াও গত ২৫ বছরে ত্রিপুরায় এক ভিন্ন ধরনের শাসন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়েছে। বিচ্ছিন্নতাকামী সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত করা হয়েছিল, বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ও সুষ্ঠ পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঐ রাজ্যে সাক্ষরতার হার পৌঁছেছিল ৯৮ শতাংশে, শিক্ষার সুযোগ পৌঁছেছিল সব অংশের মানুষের কাছে। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট শাসনে অরণ্যবাসীদের অধিকার সংক্রান্ত আইন যৌক্তিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে কার্যকরী করা হয়েছিল।

অথচ ইউ পি এ এবং এন ডি এ সরকার কেউই এই রাজ্যকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়নি। দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে মর্যাদা না দিয়ে ত্রিপুরাকে কেন্দ্রীয় সাহায্য থেকে বারংবার বঞ্চিত করা হয়েছে। কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (রেগা) সহ বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ না করে, রাজ্য সরকারের জনমুখী কর্মসূচী রূপায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যে ১১ জন কংগ্রেস বিধায়ক তাদের বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করে বিজেপি শিবিরে যোগদান করেছিলেন। এই ধরনের অস্থির পরিস্থিতিতে ত্রিপুরায় ভোটারদের এক ক্ষুদ্র অংশ ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আই পি এফ টি-র উগ্র প্রচারে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

বর্তমান বি জে পি-আই পি এফ টি জোট সরকার শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই, ত্রিপুরায় অদৃষ্টপূর্ব ঘটনা ঘটছে। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরেই ভয়াবহ আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। আশির দশকের ভয়াবহ সন্ত্রাসের পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। সমগ্র ত্রিপুরা জুড়েই বিধানসভা নির্বাচনের পর সন্ত্রাসের আবহ তৈরী হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বামপন্থী নেতৃত্ব ও কর্মীদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়। তাঁদের বাড়ীঘরে ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ঘটে। ৫১৪ জন ব্যক্তি আক্রান্ত হন, ১৫৩৯টি বাড়ী ভাঙ্গা হয়, ১৯৬টি বাড়ীতে আগুন লাগানো হয়। ১৩৪টি রাজনৈতিক দলের দপ্তর আক্রান্ত হয়, ২০৮টি দপ্তর দখল করা হয়। বিভিন্ন গণসংগঠনের দপ্তরও দখল করা হয় এবং এখনও এই সন্ত্রাস অব্যাহত রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ঐ রাজ্যের শ্রমিক-কর্মচারীরা সমাজবিরোধী ও দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে। রাজ্যে সন্ত্রাস বন্ধ ও শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। এই ধরনের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সম্মেলন ত্রিপুরার সংগ্রামী জনগণের প্রতি পূর্ণ সংহতি জানাচ্ছে। এই সম্মেলন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে, আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে, রাজ্যে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে। □

পশ্চিমবাংলার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ ও রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব

ভারতে আইনের শাসন ও সংবিধান গণতান্ত্রিক এই দেশের জনগণের ঐক্য ও সৌভ্রাতৃত্বের কথা বলে। কিন্তু সম্প্রতি বেশ কয়েকটি রাজ্যে আমরা অসহিষ্ণুতা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করছি। কয়েক মাস আগে একটি হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনের একজন মুখপাত্র একটি প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা করলেন, কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের মাথা কাটতে পারলে এক কোটি টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তামিলনাড়ুতে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী পেরিয়ারের মূর্তি ভেঙে ফেললো। একইভাবে ত্রিপুরাতে কিছু সমাজবিরোধী বিকৃত উল্লাসে ভেঙে ফেললো মহান লেনিনের মূর্তি। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের শাসনেও একই ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঐ রাজ্যে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল সামাজিক সম্প্রীতি, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ ও শক্তিশালী স্বায়ত্তশাসন গড়ে তোলার জন্য। বর্তমান তৃণমূল সরকার রাজ্যে সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক, রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে ধ্বংস করছে। রাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ নামিয়ে আনছে তৃণমূল সরকার। রাজ্যে ক্ষমতা দখলের পর থেকেই বহু বামপন্থী কর্মীকে আহত এমনকী হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ সংগঠনগুলির দপ্তর ও সম্পত্তি বেআইনীভাবে দখল করা হয়েছে। এমনকী কোথাও কোথাও ধ্বংস ও ভস্মীভূত করা হয়েছে। এই সরকার যে কোনো রকম বিরোধিতার কণ্ঠ রোধ করতে চায়। গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আইনী পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন করেও কোনো ফল হয় না। বিরোধীদের ওপর আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিনই নারী ও শিশুদের ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানীর ঘটনা ঘটে। সাম্প্রদায়িক হিংসা যা তিন দশকের বাম শাসনকালে ছিল না, তা বর্তমান সময়ে গোটা রাজ্যতেই ছড়িয়ে পড়ছে।

উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বর্তমান শাসক দল রাজ্যে কী ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বিগত কয়েকদিনে বাসুদেব আচারিয়া ও রামচন্দ্র ডোমেরমতন প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত বামপন্থী নেতৃত্বকে শারীরিক আক্রমণ করা হয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সমগ্র পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্রিয়াটিকেই প্রহসনে পরিণত করা হচ্ছে। একই ধরনের আক্রমণ-এর শিকার প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মরত কর্মচারীরাও।

এমতাবস্থায় এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছে। □

জাতীয় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

(১) মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ কর এবং গণবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী কর।
(২) সাম্প্রদায়িকতা বন্ধ হোক ঃ ধর্মনিরপেক্ষতাকে রক্ষা কর।
(৩) শ্রম আইন বিরোধী নীতি সমূহ এবং বিভিন্ন সংশোধনী বাতিল কর।
(৪) মৌলিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে রক্ষা করার সংগ্রামকে শক্তিশালী কর।
(৫) শাসক শ্রেণীকে সংবিধান প্রদত্ত প্রশ্নাতীত বৈষম্যমূলক সুবিধাগুলি বাতিল কর।
(৬) পি এফ আর ডি এ আইন রদ কর, জাতীয় পেনশন প্রকল্প বাতিল কর এবং সংজ্ঞায়িত পেনশন প্রাপ্তির সুবিধা পুনঃ প্রবর্তন কর।
(৭) সমস্ত ধরনের আউটসোর্সিং বন্ধ কর এবং সরকারী প্রশাসনে চুক্তি ভিত্তিক ও অনিয়মিত নিয়োগ করা চলবে না।
(৮) বিজ্ঞানসম্মত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতিতে আয়করের সর্বোচ্চ সীমা পুনর্নির্ধারণ কর।
(৯) নীতি ও কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাব (এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা সম্পর্কে দুটি পৃথক প্রস্তাব গৃহীত হয়, যার পূর্ণ বয়ান প্রকাশিত হলো। □

ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন কেরালার প্রতিনিধি, পশ্চিমবাংলার কর্মচারীদের লড়াইয়ের প্রতি সংহতি জানাচ্ছেন মহারাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। ত্রিপুরায় আক্রান্ত কর্মচারীদের পাশে

থাকার অঙ্গীকার গ্রহণ করছেন তামিলনাড়ুর কর্মচারীরা— এ যেন এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের নিদর্শন—যা জাত-পাত, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদি বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে মেহনতী মানুষের ঐক্যকে মজুত করতে বদ্ধ পরিকর।

বিগত সম্মেলনের ঐতিহ্য অনুসরণ করে এবারের সম্মেলনেও মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশন

৫ এপ্রিল সকাল ১০টায় রক্ত পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে জাতীয় সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি এ কে পদ্মনাভন। শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে, শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন এ কে পদ্মনাভন এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার। বাদ্যযন্ত্র ও আতসবাজির মাধ্যমে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষিত হয়।

প্রতিনিধি ও দর্শক প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও রাজ্য সভার সদস্য টি কে রঙ্গরাজন। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ-র সহ সভাপতি এ কে পদ্মনাভন। তিনি বলেন, পুঁজিবাদের সংকটকে মেহনতী মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে শ্রমিক কর্মচারীদের পাশাপাশি কৃষকরাও যখন সারা দেশে লড়াই-এ নামছেন, তখন খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্যকে ভাঙতে চাইছে সাম্প্রদায়িক শক্তি। তাই এই লড়াইয়ে আমরা জয়ী হতে পারবো কিনা তা নির্ভর করছে আমাদের ঐক্যকে আমরা রক্ষা করতে পারবো কিনা তার ওপর। উদ্বোধনী অধিবেশনে সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আরো যারা বক্তব্য রাখেন, তারা হলেন— কে কে এন কুট্টি (কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক কর্মচারী কনফেডারেশন), সি জি নন্দকুমার (ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন), কে রাজেন্দ্রন (স্কুল টিচার্স ফেডারেশন), এন এন শ্রীধরণ (তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন)। ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানান টি কলাইসেলভি (তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন)। বিকেল ৩ টায় শেষ হয় উদ্বোধনী অধিবেশন।

প্রতিনিধি অধিবেশন

সম্মেলনের প্রথম দিনের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতেই শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সহ-সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুল কুমার দাস। বাংলাদেশের প্রতিনিধি জাহাঙ্গীর আলম সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। শ্রীলঙ্কা কর্মচারী সংঠনের পক্ষ থেকে প্রেরিত অভিনন্দন বার্তা পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ইংরেজিতে পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার ও হিন্দীতে সাধারণ সম্পাদকের উত্থাপিত বক্তব্য তর্জমা করেন মঞ্জুল কুমার দাস। সাধারণ সম্পাদকের উত্থাপিত প্রতিবেদনের উপর ২২টি রাজ্য থেকে ৪ জন মহিলাসহ ৪৪ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ

মানস দাস

থেকে পরিস্থিতি নিয়ে হিন্দীতে বক্তব্য রাখেন অন্যতম সহ সম্পাদক মানস দাস ও সংগঠন নিয়ে ইংরেজিতে বক্তব্য রাখেন অন্যতম সহ সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস। প্রতিনিধি অধিবেশনের বিভিন্ন সময় মোট ১১টি প্রস্তাব পেশ করা হয়। জাতীয় কার্য নির্বাহিক কমিটির সদস্য হিসাবে বিজয়শঙ্কর সিংহ জনস্বার্থ বিরোধী, জাতীয় স্বার্থবিরোধী আর্থিক নীতি ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পক্ষে প্রস্তাব পেশ করেন। ত্রিপুরায় বিগত

অনুপ বিশ্বাস

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর থেকে যে তীব্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস সংগঠিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে বিগত প্রায় সাত বছরযাবৎ শাসকগোষ্ঠীর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও পৃথক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সংগঠনের সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন

কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন

হিমাংশু সরকার। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনের উপর ত্রিপুরার পক্ষ থেকে আলোচনা করেন সুচিত্র জামাতিয়া এবং স্বপন বল।

সমগ্র আলোচনান্তে জবাবী ভাষণ দেন সাধারণ সম্পাদক শ্রী কুমার। তিনি বলেন, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট আজও বিদ্যমান, বিশ্বজুড়ে বেকারি বাড়ছে। আর্থিক অসাম্যের বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি ঘটেছে। সমগ্র বিশ্বেই শ্রমজীবী মানুষ নয়া উদারবাদী এই আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে অন্দোলন সংগ্রাম করছে। আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় মদতে হিন্দুত্ববাদী শক্তি মাথা চাড়া দিচ্ছে। নয়া পেনশন স্কীম বাতিলের দাবিতে সমস্ত রাজ্য লড়াই করছে। এই লড়াইকে আরো শক্তিশালী করা দরকার। তিনি বলেন, এই সামগ্রিক আক্রমণের মোকাবিলা করতে গেলে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন করা দরকার। আগামী বছর লোকসভা নির্বাচনকে দেশের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ সম্পাদকের জবাবী বক্তব্যকে হিন্দীতে তর্জমা করেন সুভাষ লাম্বা। প্রতিনিধি অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বিএসএনএল কর্মচারী সংগঠনের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব পি অভিমন্যু। প্রতিনিধি অধিবেশনের বিশেষ আকর্ষণ ছিল দুটি আলোচনা সভা। বিষয়গুলি ছিল—(১) ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামনে সমস্যা এবং (২) ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বিপদ, আলোচক ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক ভেঙ্কটেশ আত্রেয়া এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী। □

আক্রান্ত মনুষ্যত্ব, আক্রান্ত গণতন্ত্র— এত ভয় কিসের

কুমকুম মিত্র

"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান—বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান"। চির পরিচিত এই গর্বের কথাগুলি ক্রমশঃ কেমন যেন ঝাপসা করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে প্রতিনিয়ত। মহামিলন যেন অবলুপ্তির পথে। পরিচিতি সত্তার রাজনীতি, বিভাজনের রাজনীতি, ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি যেন ধুলিসাৎ করে দিচ্ছেএই বিখ্যাত লাইনটিকে।

এই মুহূর্তে সারা দেশ ও রাজ্যে আমাদের জীবন-জীবিকা, মনুষ্যত্ব ও গণতন্ত্র প্রতিটি ক্ষেত্রই আক্রান্ত ও ক্রমশঃ বিপদাপন্ন হয়ে পড়ছে। এর মধ্যে মনুষ্যত্ব নামক ক্ষেত্রটি যেন আরো প্রকটভাবে আক্রান্ত। আমাদের দেশে ও রাজ্যে মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে যে মাত্রায় যৌন হিংসার ঘটনা ঘটছে, তা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে মোদী-শাহের প্রচারের অন্যতম বিষয় ছিল দেশে বা রাজ্যে রাজ্যে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনার অবসান ঘটানো। সরকারে আসার পরে দেখা গেলো নির্যাতন-ধর্ষণ শ্লীলতাহানি- হত্যা রোজকার ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু নয়, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাষ্ট্রসংঘের ভারতের রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর ইউরি আফানসিয়েড ভারতের এই যৌন হিংসার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই সমস্ত মনুষ্যত্বহীন ন্যক্কারজনক ঘটনাকে 'ভয়ানক' আখ্যা দিয়েছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেস।

কাঠুয়া, উন্নাও, সুরাট কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রতিদিন প্রায় প্রতিক্ষণ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে, বিভিন্ন গ্রাম শহরে ঘটে চলেছে নারী ও শিশু ধর্ষণ নির্যাতন-হত্যার ঘটনা। আজও কানে বাজে আট বছরের শিশু আসিফার কান্না। জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দা ছোট্ট আসিফা গত ১০ জানুয়ারি ২০১৮ ঘোড়া চরাতে গিয়ে নিখোঁজ হয়। পরে তার মৃতদেহ পাওয়া যায় 'দেবীস্থান' নামক একটি মন্দিরের সামনে। অভিযুক্ত মন্দিরের পূজারী সঞ্জীরাম, তার ছেলে ও নাবালক ভাইপো, এছাড়াও স্পেশাল পুলিশ অফিসার দীপক খাজুরিয়া, সুরেন্দ্র বর্মা প্রমুখ গুণীজনেরা। ছোট্ট মেয়েটির অপরাধ—সে একজন মুসিলম গুজ্জর বাকরাওয়াল উপজাতি পরিবারের মেয়ে। এই সম্প্রদায়কে উৎখাত করতেই নির্যাতন, ধর্ষণ ও খুনের মতো অস্ত্রকে বেছে নিয়েছে সংখ্যাগুরু উগ্র সাম্প্রদায়িক দল। এর থেকে কি প্রমাণ হয় না যে, দেশে একমাত্র পরিচিতি সত্তা, বিভাজন ও ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি চলছে। কাঠুয়া কাণ্ডে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার পর বি.জে.পি-র মন্ত্রী ও তার সমর্থকরা ধর্ষকদের সমর্থনে মিছিল বের করে, তাদের স্বপক্ষে শুধু জাতীয় পতাকা উড়ায়নি, রাতারাতি গড়ে তোলে 'হিন্দু একতা মঞ্চ'। মৌলবাদের রাজনৈতিক ঝাণ্ডা নিয়ে হিন্দুরা পথে নামে, পথে নামে বি.জে.পির দুই মন্ত্রী চন্দ্রপ্রকাশ গঙ্গা ও লাল সিং, শুধুমাত্র ধর্ষকদের মুক্তির দাবীতে। হিন্দু মহিলারা হুমকি দেয় অপরাধীদের ছেড়ে না দিলে তারা গায়ে আগুন দেবে। আইনজীবীরা নারা তোলে 'জয় শ্রীরাম'। ভাবুন কোথায় এগিয়ে না পিছিয়ে চলেছে আমাদের দেশ। উত্তরপ্রদেশের উন্নাও-এর তরুণীর একবছর হয়ে গেল এখনো তাকে ধর্ষণে অভিযুক্তদের কোন শাস্তি হয়নি। পুলিশ নিতে চায়নি কেস ডাইরি, উল্টে তার বাবাকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে থানার মধ্যে অকথ্য অত্যাচার করে মেরে ফেলে। যোগী আদিত্য নাথের সাম্রাজ্যসহ সারা দেশে যখন সাড়া পড়ে গেছে, তখনই আবারো গত ১৯ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশের আলিগঞ্জ থানার কেলঠা এলাকায় স্থানীয় এক গাড়ীচালক নয় বছরের একটি শিশুকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। রাজধানী দিল্লীতে যখন কাঠুয়া-উন্নাও নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় উঠছে, তখনই সেই দিল্লী আরো একটি নক্কারজনক ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল। পশ্চিম দিল্লীর রোহিণীতে গত ১৩ এপ্রিল'১৮ মানসিক ভারসাম্যহীন এক ১২ বছরের কিশোরীকে বান্টি নামের এক যুবক ও তার বন্ধুরা তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে এবং শুধু এতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তাদের এই মনুষ্যত্বহীন

বিকৃত মানসিকতার সম্পূর্ণ ঘটনাটি ভিডিও করে হোয়াট্স্অ্যাপে ছড়িয়ে দেয়। ভাবা যায় না, শুধু অনুধাবন করা যায় যে, আমাদের সমাজের সংস্কৃতি কোথায় নেমে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে তো দিল্লীর আরেক নাম 'রেপ ক্যাপিটাল' হয়ে গেছে। নির্ভয়া কাণ্ডের পরেও দেশে নারী নিগ্রহ ঘটনার চিত্র এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি। ন্যাশনাল ক্রাইম রিসার্চ ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী— ২০১৫ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে শিশু কন্যা ধর্ষণের সংখ্যা ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি এটাও জানা গেছে যে ধর্ষণের দায়ে অভিযুক্তদের একটা বড় অংশই নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও বিজেপির লোকজন। প্রতিটি ধর্ষণের ঘটনার মধ্য দিয়েই হয়েছে আধিপত্য কায়েমের প্রচেষ্টা ও জয়ের উল্লাস। কাঠুয়ার ঘটনার পর পশুপালন যাদের জীবিকা তারা কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে একে একে চলে যাচ্ছেন। কুশমণ্ডির আদিবাসী মেয়েটিকে ধর্ষণ তাকে তার জমি-জঙ্গল থেকে উৎখাত করেছে। মুজফ্ফরনগর দাঙ্গায়, ওড়িশার কন্ধমালে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধেও একই অস্ত্র প্রয়োগ হয়েছিল। অথচ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিখ্যাত স্লোগান হলো—'বেটি বাঁচাও-বেটি পড়াও'। বেটি বাঁচাও-এর প্রেক্ষিত হলো, মহিলারা তাদের জনগোষ্ঠীর যৌনপণ্য। পণ্য যেমন লুঠ করা যায়, ধর্ষণ তেমনই হলো লুঠের পন্থা। আর এই নরকের ভাষা শেখাচ্ছে হিন্দুত্ববাদীরা। উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ও আর এস এস-এর মতাদর্শ ধর্ষণকে স্বীকৃতি দেয়। কারণ নারী তাদের কাছে শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের বস্তু।

শুধু দেশ নয়, আমাদের রাজ্যও বাদ নয় এই কুখ্যাত সংস্কৃতি থেকে। একটু পিছনের দিকে ফিরে তাকালেই দেখা যাবে—পার্ক স্ট্রীট থেকে কাটোয়া, কামদুনি সর্বত্রই একই চিত্র। রাজ্যের শাসকদলের কর্ণধারের কাছে সমস্ত নারী নির্যাতনের ঘটনা—কখনো তার দুষ্টু-দামালদের কাজ, কখনো আবার ছোট্ট ঘটনা আবার কখনো সাজানো ঘটনা বা বিরোধীদের চক্রান্ত। এখনো পর্যন্ত রাজ্যে যত নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, সবসময়ই দেখা গেছে অভিযুক্তদের পক্ষে দাঁড়িয়েছে রাজ্যের শাসকদল, শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা। রাজ্যেও নারী নির্যাতন চিত্র একই রয়েছে, যদিও রাজ্যের কর্ণধার নারী। প্রতিদিনই প্রায় সংবাদ শিরোনামে থাকে কোন না কোন নারী-শিশুকে যৌন নির্যাতনের ঘটনা। কিছু দিন আগেও উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে দুইজন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রীকে ঐ স্কুলের শিক্ষক টানা দু'মাস ধরে যৌন নির্যাতন করে। এখনো তারা কোন সুবিচার পায়নি। ধর্ষণ শুধুমাত্র শারীরিকভাবেই হয় তা নয়, মানসিক ধর্ষণের স্বীকারও প্রতিনিয়ত এ রাজ্যের নারী ও শিশুরাা হচ্ছে। জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে নগ্ন করে মারধোর করা হয়। তার দোষ— তার বাছুরের অভিযুক্তের ক্ষেতে ঢুকে পড়া। সামান্য এই কারণে ঐ কিশোরীকে কত বড় মানসিক ধর্ষণ করা হয়। এখনো পর্যন্ত কিশোরী কোন সুবিচার পায়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরের লালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলকার বাসিন্দা এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীকে তার বাবা এক পঞ্চাশোর্ধ কাশ্মীরীর সাথে জোর করে বিবাহ দিয়ে কাশ্মীরে পাঠিয়ে দেয়, যার আগের দুই স্ত্রী ও সন্তান বর্তমান। সেখানে প্রচুর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করার পর কিশোরীটি লুকিয়ে পালিয়ে আসে তার গ্রামে। কিন্তু তার বাবা তাকে বাড়ীতে স্থান দেয়নি, তাকে মেরে আবার কাশ্মীরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে, কারণ তিনি তো কার্যত তার মেয়েকে বেচে দিয়েছেন। এই হচ্ছে মনুষ্যত্বের রূপ। প্রতিনিয়ত এই রকম বহু ঘটনা ঘটে চলেছে যা অপ্রকাশিত হয়ে আছে। সর্বশেষ যেটা বলা যায়—সম্প্রতি পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মনোনয়ন পত্র পেশ করার সময় দুই দিনই শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনী দ্বারা মহিলা প্রার্থী ও সমর্থকদের উপর কি ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন করা হয়েছে। মহিলাদের গলাটিপে, চুলের মুঠি ধরে মারছে পুরুষ গুণ্ডাবাহিনী। এমনকি গায়ের আঁচল খুলে নিয়েও নির্যাতনের, শ্লীলতাহানির চিত্র আমরা সকলেই দূরদর্শনে ও দৈনিক সংবাদপত্রে দেখেছি। কোথায় গেছে আমাদের মনুষ্যত্ব, গণতন্ত্র, সংস্কৃতি। আমাদের দায়িত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্ষণকারী-নির্যাতনকারীদের প্রশ্রয়দাতাদের বুঝিয়ে দিতে হবে—পুরুষাঙ্গ, যোনি ও বিকৃত মানসিকতা দিয়ে সংস্কৃতি, আধিপত্য, সমাজ সৃষ্টি নয়। সমাজ সৃষ্টি করে মগজ, বুদ্ধি, মেধা ও কর্মদক্ষতা দিয়ে। সংস্কৃতি সৃষ্টি করে মনুষ্যত্ব। রাজ্যে শাসকদলের প্রচারিত কথা অনুযায়ী যদি উন্নয়নের জোয়ার বয়ে গেছে, তাহলে বিরোধীদের মনোনয়ন পেশে এত বাধা, দাঙ্গা কেন? এত ভয় কিসের সঠিক পদ্ধতিতে ভোটগ্রহণ পর্ব সম্পন্ন করার। উন্নয়ন হলে মানুষ তো এমনিই ভোট দেবে। তাহলে নিশ্চয় শাসকদল রাজ্যবাসীকে ভুল বুঝাচ্ছে, ঠকাচ্ছে। আমাদের সেটাই ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। তাই আমার মনে হয় ---তথাকথিত রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের প্রকৃত অর্থ হলো—

মা = সন্তানহারা
মাটি = রক্তেভরা
মানুষ = দিশোহারা

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংগঠন আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সংগঠন তহবিল সংগ্রহ অভিযান সফল করুন

বিজয় শংকর সিংহ
সাধারণ সম্পাদক

অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলনের পরবর্তীতে সংগঠনের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা ও বর্তমান অভূতপূর্ব এক কঠিন জটিল পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রতিনিয়ত সারা রাজ্য জুড়ে ধারাবাহিকভাবে কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আন্দোলন সংগঠিত করা এবং প্রতিনিয়ত তা জারি রাখার কাজ অব্যাহত রয়েছে। সংগঠনের এই বিশাল কর্মকাণ্ডসহ সংগ্রাম আন্দোলনের কর্মসূচী পরিচালনা করতে বিশাল ব্যয়ভার বহন করতে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা করতে হয় সংগঠনকে। স্বাভাবিকভাবে সংগঠনের প্রয়োজনেই অর্থ সংগ্রহের কর্মসূচী সংগঠনকে গ্রহণ করতে হয়।

বর্তমানে প্রতিনিয়ত কঠিন পরিস্থিতি ও আক্রমণ মোকাবিলা করতে সংগঠন পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহ অভিযান কর্মসূচী অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সরাসরি কোনো সদস্য নেই। সুতরাং সদস্য চাঁদাও নেই। সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ৩২টি সমিতি থেকে খুব অল্প মাসিক লেভি ও বাৎসরিক ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা এফিলিয়েশন ফি থেকে সারা রাজ্য জুড়ে বিস্তৃত সংগঠনের (৩৪১টি ব্লক, ৮৭টি মহাকুমা, ১৯টি জেলা ও কলকাতার ৭টি অঞ্চল) বিভিন্নমুখী কর্মসূচী ও দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য খরচ চালানো কোনোমতেই আমাদের মতো সংগঠনের পক্ষে সম্ভব নয়। পাশাপাশি আর্থিক দাবি দাওয়া আদায়সহ প্রতিনিয়ত স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্র হরণকারি সন্ত্রাস ও আক্রমণ মোকাবিলা করতে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নিরন্তর সংগ্রাম আন্দোলনের প্রবাহ সংগঠনের সর্বস্তরে পরিচালনা করতে বিশাল অর্থের ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

বর্তমানে ২০১১ সালের পর রাজ্যের রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তনের পর প্রশাসনের অভ্যন্তরে ব্যপক সন্ত্রাস, ভয়ভীতিসহ প্রচণ্ড আক্রমণ মোকাবিলায় একমাত্র আমাদের সংগঠন কর্মচারী সমাজ ও তার পরিবারকে রক্ষা করার স্বার্থে আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে অকুতোভয় পরিস্থিতি ভেদ করেই দৈনন্দিন লড়াই সংগ্রাম জারি রেখেছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের কর্মচারী সমাজ শুধু উপলব্ধি করছেন তা নয়, আমাদের সংগঠনের উপর তাদের আস্থা ভরসা নির্ভরতা ও বিশ্বাস ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই মনে রাখতে হবে সংগঠনের সর্বস্তরে কর্মচারী সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংগ্রাম আন্দোলন জারি রাখতে আমাদের আরো বর্ধিত দায়িত্ব নিতে হবে।

রাজ্যের কর্মচারীরা আর কতদিন এই ধারাবাহিক অস্থিরতা সন্ত্রাস ভয়ভীতি ও পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনার জ্বলন্ত সমস্যা (বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন চালু না হওয়া) সহ্য করবে? যেখানে ভারতবর্ষের প্রায় সব রাজ্যে মহার্ঘভাতা আপ-টু-ডেট ও পে কমিশন চালু হয়েছে। এই চরম সীমাহীন বঞ্চনার প্রতিবাদে সারা রাজ্য জুড়ে কর্মচারীরা দেখছেন প্রশাসনের অভ্যন্তরে সন্ত্রাস ভয়ভীতি ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়রানিমূলক বদলী সংগঠক নেতৃত্বকে করলেও আত্মত্যাগের মানসিকতা নিয়ে সাহসের সাথে একমাত্র রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি শো-কজ সাসপেনশন ও এফ.আই.আর-কে উপেক্ষা ও ভয়কে জয় করেই ধারাবাহিকভাবে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রাম আন্দোলন প্রতিনিয়ত করে যাচ্ছে।

বিগত বছরগুলিতে একের পর এক প্রত্যক্ষ সংগ্রামে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে শামিল হয়েছে আমাদের সংগঠন। যথাক্রমে গণঅবস্থান (৫দিন ধরে ওয়াই চ্যানেল), কেন্দ্রীয়ভাবে একাধিক মিছিল সমাবেশ, টিফিনের সময় বিক্ষোভ, স্থানীয় স্তরে কর্মচারী বিরোধী সিদ্ধান্তের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ডেপুটেশনের কর্মসূচী, অভিনব অ্যাপ্রন পরে অফিসে সারাদিন থাকাসহ টিফিনে বিক্ষোভ, নবান্ন অভিযানের মতো কর্মসূচী, বিকাশ ভবনে দু'বার পে কমিশন দপ্তর অভিযান—দ্বিতীবার অভিযানে সংগ্রামী মেজাজে স্টীলের ব্যারিকেড ভাঙা, এমনকি ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করা, (ডায়াস নন, বেতন কাটা সত্বেও) নবান্নতে সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদকের উপস্থিতিতে বিক্ষোভ, রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশনসহ একাধিক কর্মসূচীর সাফল্য কর্মচারী মনোজগতের আস্থা বৃদ্ধি করতে পেরেছে। তাই সময় এসেছে সব কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে "Enough is enough"—এই মানসিকতা নিয়ে বৃহত্তর সংগ্রামে (প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো) আরো দৃঢ়তার সাথে গর্জে ওঠার। যারা অন্যায় অবিচার করছে, সরকারী টাকা হরিরলুটের মতো বিলি করছে বা লুট করছে তারা ভয় পাবে। আমরা কোনো অন্যায় করি নি ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, তাই কর্মচারীদের প্রাপ্য আর্থিক দাবি বা সম্মানের প্রশ্নে আমাদের সংগঠন কোনো হুমকির কাছে মাথা নত করবে না বরং পরিস্থিতি ভেদ করে আরো প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যাওয়ার সর্বত্র প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে বর্তমান কর্মচারী সমাজ এই ঐতিহ্যবাহী সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উত্তরাধিকারি। সংগঠনের পূর্বসূরীদের গৌরবজনক আত্মত্যাগী, সাহসী সংগ্রামের উত্তাপ ধারণ করে বর্তমান পরিস্থিতিকে ভেদ করেই শতবর্ষের দিকে ধাবিত সংগঠনের সুমহান ঐতিহ্যকে ধরে রাখা আশু জরুরি। স্বাভাবিকভাবে সংগঠনকে পরিস্থিতি মোকাবিলায় আরো উপযুক্ত ও শক্তিশালী করতে ধারাবাহিক কর্মসূচীর ফলে ও সারা রাজ্য জুড়ে সংগঠনের দৈনন্দিন বিশাল কর্মকাণ্ড কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে বিশাল অর্থ খরচ হচ্ছে। সংগঠনের তহবিল দুর্বল হয়ে পড়ায় প্রয়োজনভিত্তিক সংগঠন তহবিল সংগ্রহের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়েছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে। মাসিক ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের কাছ থেকে ১০০ টাকা, ২০,০০১ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১৫০ টাকা, ৩০,০০০ টাকার উর্দ্ধে ২০০ টাকা এবং ফ্যামিলি পেনশনার্সদের জন্য ৫০ টাকা হারে তহবিল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত ২৪-২৫ মার্চ, ২০১৮ সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা রাজ্য কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ সভা থেকে গৃহীত হয়েছে। মে-জুন, ২০১৮ মাসের বেতন থেকে রাজ্যব্যাপী এই তহবিল সংগ্রহ চলবে।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ী যে রাজ্যের সচেতন ও সংগ্রামী কর্মচারীরা অতীতের ন্যায় এবারও বর্তমান কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং আগামীতে লাগাতার সংগ্রাম আন্দোলন পরিচালনায় সংগঠনকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে সর্বত্র উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

আমরা জানি রাজ্যের কর্মচারী সমাজ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে আজ মহীরূপে পরিণত করেছেন ও শক্তিশালী করেছেন—যা অনস্বীকার্য। সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার মধ্য

দিয়ে সংগঠনের সাথে কর্মচারী সমাজের নাড়ির যোগাযোগ। তারা জানেন সংগঠনের লড়াই আন্দোলন পরিচালনার স্বার্থেই প্রয়োজনভিত্তিক অর্থ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি সংগ্রহ করে থাকে। কর্মচারীরা জানেন আমাদের সংগঠন গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় এবং তিন বছর অন্তর রাজ্য সম্মেলনে প্রতিটি

সংগঠনকে আরো শক্তিশালী
এবং
পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী প্রত্যক্ষ সংগ্রামকে আরো তীব্রতর করার লক্ষ্যে

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির
আহ্বানে

সংগঠন তহবিল সংগ্রহ কর্মসূচী, ২০১৮

তহবিল সংগ্রহের হার :

২০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট বেতন	১০০ টাকা
২০,০০১ টাকা থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত	১৫০ টাকা
তদূর্দ্ধে	২০০ টাকা

সকল কর্মচারীবন্ধু তহবিল সংগ্রহ কর্মসূচী সফল করুন।

পয়সার হিসাব (Audited Report) ছাপিয়ে পেশ করা হয়। মামলা মোকদ্দমা করে কিছু পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা তোলা হয় না। রাস্তায় নেমে আপসহীন সংগ্রাম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দাবি দাওয়া ও অধিকারকে রক্ষা এবং আক্রমণ মোকাবিলা করার পথেই কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধ করেছে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তাই রাজ্যের লড়াকু সচেতন কর্মচারীরা বহু কঠিন পরিস্থিতিতে জ্বলন্ত আর্থিক ও অধিকারগত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলন সংগ্রামের জন্য আবশ্যিক প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা মেটাতে কোনদিন কোনো কার্পণ্য করেননি। পশ্চিমবাংলার সংগ্রামী কর্মচারীদের সুদীর্ঘকাল ধরে এই ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকার জন্য আমরা গর্ব বোধ করি। রাজ্যের ও দেশের মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনে আমাদের ভূমিকা সারা দেশে স্বীকৃত। তাই কর্মচারীদের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে যে বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা অতীতের যে কোনো তহবিল সংগ্রহের রেকর্ডকে ম্লান করে সর্বাত্মক সফল করে তুলবেন। জেলা ও কলকাতার অঞ্চলগুলির সংগঠন তহবিলের সংগৃহীত অর্থের সমস্তটাই জেলা, অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় স্তরে সমস্ত দৈনন্দিন কাজ, ব্যাপক প্রচার, সংগ্রাম আন্দোলনের কর্মসূচী ও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালনসহ সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। সারা রাজ্যব্যাপী ৩৪১টি ব্লক, ৮৭টি মহকুমা, জেলা ও কলকাতার অঞ্চলগুলিসহ কেন্দ্রীয় দপ্তর পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক কার্যক্রম ও সংগ্রাম আন্দোলন ও ধারাবাহিক কর্মসূচী পরিচালনায় খরচ কী পরিমাণ হতে পারে, তার ধারণা যদি না থাকে তাহলে তহবিল নিয়ে প্রশ্ন থাকা অস্বাভাবিক নয়, তবে সমস্ত কর্মচারীদেরই এমন ধারণা আছে এমন মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

অধিকাংশ সংগঠন দপ্তরের ভাড়া বা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ট্যাক্স, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, ফ্যাক্সের খরচ, ডাক খরচ, যাতায়াত খরচ, অতি সামান্য টিফিনের ব্যবস্থা, বড় সভা করার জন্য হল ভাড়া, প্রচারের ব্যাপক খরচ, স্টেশনারী খরচ, প্রকাশ্য কর্মসূচীর জন্য মঞ্চ তৈরী সহ চেয়ার, টেবিল, মাইক, আলোসহ অন্যান্য সামগ্রী ও নানাবিধ খরচের পরিমাণ ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির কারণে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে ও জেলা হেড কোয়ার্ডার থেকে দূরবর্তী ব্লকগুলিতে সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে প্রতিনিধিদের যাতায়াত খরচ এতটাই যে কারণে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। এছাড়া ২০১১ সালের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অর্জিত অধিকার রক্ষার স্বার্থে একাধিক মামলা করতে হয়েছে। সেই জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্নমুখী আক্রমণ মোকাবিলায় কর্মচারীদের পাশে থাকার লক্ষ্যে বা সংগ্রাম আন্দোলনের জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের সঞ্চিত অর্থ থেকে সাহায্য করতে হয়। তহবিল একেবারে নিঃশেষিত না হলে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তহবিল সংগ্রহ করে না। তাই কর্মচারীরা আর্থিক দাবি দাওয়া বকেয়া থাকলেও প্রয়োজনে আন্দোলনের স্বার্থেই তহবিল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করতে কোনদিনও কোনো কুণ্ঠাবোধ করেননি। ষড়যন্ত্র আক্রমণকে মোকাবিলা করেই এই অনন্য নজির ও ঐতিহ্য বহন করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে এবং অগ্রগামী কর্মচারী সমাজ এই নীতির প্রতি সমর্থন ও মর্যাদা দিয়ে সহমত পোষণ করে চলেছেন। চরম আর্থিক বঞ্চনার মধ্যে তহবিল সংগ্রহ অভিযানের কর্মসূচী নেওয়ার ক্ষেত্রে দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাজ করেছে, কিন্তু সংগ্রহের সময় দেখা গেছে কর্মচারীরা ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তা ভুল প্রমাণিত করেছেন। আর্থিক বিষয়ে বা প্রয়োজনভিত্তিক তহবিল সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিশ্বাসযোগ্যতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিরোধী সংগঠনের অনেক সাধারণ সদস্যও অতীতে তহবিলে অর্থ প্রদান করেছেন। তাই ব্যাপক সন্ত্রাস ও দমন পীড়ন থাকলেও সংগ্রাম আন্দোলন থেমে যায়নি। কর্মচারী সমাজ সবসময় পাশে থেকেছেন।

প্রশাসনের অভ্যন্তরে একমাত্র রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলি প্রতিকূল পরিস্থিতি ভেদ করে কর্মচারী স্বার্থে প্রতিদিন লড়াই করছে। স্বাভাবিকভাবে সংগ্রাম আন্দোলনের পরিধি আরো বিস্তৃত হয়েছে। অর্থের প্রয়োজন ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আমাদের আশা ভরসার দিক হলো, কর্মচারীদের সেই চেতনা ও উপলব্ধি প্রতিনিয়ত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। সর্বস্তরের কর্মচারী সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ, মত বিনিময়, পরামর্শ ছাড়া সংগঠন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে না। তাই যথাযথ মর্যাদা দিয়ে সংগঠন সর্বস্তরে কর্মচারীদের সাথে আত্মিক যোগাযোগ রেখে চলেছে। মনে রাখতে হবে তহবিল সংগ্রহ অভিযান সংগ্রাম আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী। সুতরাং সর্বস্তরে সংগঠনের কর্মী নেতৃত্বর সেই সচেতন উপলব্ধি থাকা দরকার। তহবিল সংগ্রহের মধ্য দিয়ে সমগ্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য সম্পর্কে সমগ্র কর্মচারী সমাজকে আগ্রহী ও সচেতন করে তুলতে হবে।

বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের পাহাড় প্রমাণ আর্থিক বঞ্চনা (বকেয়া ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন চালু না হওয়া) ও অধিকারগত সুযোগ সুবিধা হরনের লক্ষ্যে ও চাকুরির শর্তাবলীকে কঠোর ও আক্রমণাত্মক করার জন্য বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণ ও উদারীকরণের নামে সারা বিশ্বে, আমাদের দেশে ও রাজ্যে আপাদমস্তক নয়া উদারনীতির সমর্থনকারী রাজ্য সরকারের গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলছে। প্রশাসনের অভ্যন্তরে কর্মচারী জীবনে ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন জীবিকায় যা ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলেছে।

সুবিধাবাদী মানসিকতা পরিহার করে উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানসিকতা সম্পন্ন প্রত্যক্ষ আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া এই ভয়ঙ্কর আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। তার জন্য চাই সমগ্র কর্মচারী সমাজের নিশ্ছিদ্র ঐক্য ও আত্মত্যাগী সংগ্রামী মেজাজ। মনে রাখতে হবে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উপর নির্মম আক্রমণের প্রতিবাদে একমাত্র বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও আমাদের সংগঠন প্রহরীর মতো কাজ করে এসেছে। তাই আগামীতে যত ঝড়ঝঞ্ঝা আসুক না কেন আমরাই সাহসের সাথে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে লড়াইয়ের ময়দানে থাকব।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি বামপন্থী গণমুখী মতাদর্শে আস্থা-বিশ্বাস রেখে দৃঢ়তার সাথে বর্তমানে দেশের ও রাজ্যের চরম উগ্র দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ত মনোভাবাপন্ন শক্তির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই জারি রেখেছে। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ৫-৮ এপ্রিল, ২০১৮ চেন্নাইতে ১৬তম জাতীয় সম্মেলনে সারা দেশ জুড়ে জনবিরোধী নয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে ও আর. এস. এস-বিজেপির সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি ও হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৎপরতা ও অপকৌশলের বিরুদ্ধে দেশের ঐক্য সংহতি রক্ষায় সারা দেশ জুড়ে কর্মচারীদের ঐক্যবদ্ধ করে আগামী দিনে বৃহত্তর কর্মসূচীর ডাক দিয়েছে। জাতীয় সম্মেলন থেকে আগামী ১২ জুন, ২০১৮ সারা দেশ জুড়ে রাজ্যে রাজ্যে জরুরি ৫ (পাঁচ) দফা দাবিতে "জাতীয় দাবি দিবস" পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আমাদের রাজ্যেও উক্ত দিনে কর্মসূচী পালিত হবে।

এছাড়া রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ৪৯ শতাংশ মহার্ঘভাতা অবিলম্বে প্রদান, ৬ষ্ঠ বেতন কমিশন দ্রুত চালু করা, চুক্তি প্রথায় কর্মচারীদের সম কাজে সম বেতন ও নিয়মিত কর্মচারীদের মত সুযোগ সুবিধা প্রদান, লক্ষাধিক শূন্য পদ পূরণসহ একাধিক দাবিতে বৃহত্তর কর্মসূচীর জন্য সর্বত্র ব্যাপক প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। তারই প্রাথমিক শর্ত অনুযায়ী সংগঠন তহবিল সংগ্রহের আহ্বান এসেছে। আশা করি সমগ্র কর্মচারী সমাজ সেই আহ্বানে পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী অতীতের ন্যায় বিপুলভাবে সাড়া দিয়ে তহবিল সংগ্রহ অভিযান সফল করবেন। এবং সংগঠনকে সার্বিকভাবে শক্তিশালী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। □

কর্মচারী ভবনে মে দিবস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিগত ১ মে, ২০১৮ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কলকাতার কর্মচারী ভবনে মে দিবসের কর্মসূচি প্রতিপালনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তাদের মধ্য থেকে এই আহ্বান-ই ধ্বনিত হয়। কর্মসূচীর শুরুতেই রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য। পরবর্তীতে বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম অর্থমন্ত্রী তথা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রয়াত ডঃ অশোক মিত্র এবং ১২ই জুলাই কমিটির প্রাক্তন যুগ্ম আহ্বায়ক শিশির ভট্টাচার্যের প্রয়াণে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন কর্মসূচীর সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য এবং উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয়শঙ্কর সিংহ বলেন আজ গোটা বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে প্রতিপালিত হচ্ছে ঐতিহাসিক মে দিবসের কর্মসূচী। ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট আন্দোলনে নামেন বঞ্চিত ও শোষিত শ্রমিকেরা। শিকাগো শহরে হাজার হাজার মানুষের দৃপ্ত মিছিল বের হয়। আমেরিকার অন্যান্য শহরেও শ্রমিকরা ধর্মঘট করে মিছিলে পা মেলান। শ্রমিকদের সেই আন্দোলন বেপরোয়াভাবে দমন করতে নামে মার্কিন পুলিশ। ৪ মে হে মার্কেটে শ্রমিকদের সভায় বর্বরোচিত আক্রমণ চলে পুলিশের, বয়ে যায় রক্তবন্যা। শ্রমিকদের সাদা পতাকা রক্তে লাল হয়ে যায়। বহু শ্রমিক নিহত, আহত হন। গ্রেপ্তার করা হয় শ্রমিক নেতাদের, বিচারের নামে প্রহসন চলে। ফাঁসি হয় ৪ জন শ্রমিক নেতার। ১৩২ বছর আগে শ্রমিকশ্রেণীর অধিকার রক্ষার দাবিতে এই রক্তক্ষয়ী আপসহীন সংগ্রামকে স্মরণ করেই এই দিনটি সারা বিশ্বে পালিত হয়। ১৮৯০ সালের ১ মে থেকে গোটা দুনিয়ার শ্রমিকরা মে দিবস উদ্‌যাপন শুরু করে। মে দিবস পালনের প্রস্তাবে বলা হয়, শুধু ৮ ঘণ্টা কাজ বা বিশ্রামের দাবিতেই এই মে দিবস প্রতিপালন হয়। এর প্রকৃত তাৎপর্য হলো সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রেণী বৈষম্য দূর করার এক সঙ্কল্প, কিন্তু বর্তমানে মে দিবস আমরা যখন প্রতিপালন করছি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের রাজ্যের বর্তমান সরকার মে দিবসকে অপ্রাসঙ্গিক করে দেবার লক্ষ্যে এই দিন রাজ্যের প্রথম পর্বে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন ধার্য করেছিল, কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে রাজ্যের গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষ থেকে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষ থেকে রাজ্যের নির্বাচন কমিশনে দাবি জানানো হয়েছিল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবসে ভোট না করার, কিন্তু তারা সে দাবি না মানলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন কারণে আদালতের হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে ভোটের দিন পরিবর্তন ঘটেছে। গোটা রাজ্য জুড়েই আজ গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর চরম আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীসহ সরকারী কর্মচারীরাও আক্রান্ত হচ্ছেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যপালের নিকট এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রাখার পাশাপাশি রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। দেশের ক্ষেত্রে ১৯৯১ পরবর্তীতে আমরা দেখেছি নয়া উদারনীতির নামে দেশের শাসকশ্রেণী শ্রমজীবী মানুষের ওপর চরম আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। আর্থিক সংস্কার করতে গিয়ে গরিব মানুষের ভর্তুকি হ্রাস করে ধনীদের কর ছাড় দেওয়া হয়েছে, পরিণামে গরিব আরও গরিব হয়েছে, ধনীর সম্পদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। এর বিরুদ্ধে একমাত্র বামপন্থী দলগুলি লাগাতার আন্দোলন সংগ্রাম করেছে। একের পর এক দেশ জোড়া ধর্মঘট সংগঠিত হয়েছে নয়া উদার আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে। সর্বশেষ নভেম্বর মাসে লাগাতার ধরণা কর্মসূচী সংগঠিত হয়েছে পার্লামেন্ট স্ট্রীটে। সেখান থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে দেশ জোড়া আন্দোলন গড়ে তোলার। আজ গোটা দেশের শ্রমিক শ্রেণী যখন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, দেশের সরকারের নীতি পরিবর্তন করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে তখন দেশের বর্তমান সরকার ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে মানুষের মধ্যে বিভাজনে সচেষ্ট হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে দেশের সরকারের এই আক্রমণ এবং বর্তমান রাজ্য সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী বিরোধী মনোভাবকে প্রতিহত করতে গেলে লড়াই আন্দোলন সংগ্রাম ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। মে দিবস আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

সমাবেশের প্রধান বক্তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ-সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী বলেন মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করার চক্রান্ত চলছে। শিক্ষাক্ষেত্রে গৈরিকীকরনের চেষ্টা চলছে, মুক্তমনা মানুষদেরকে আক্রমণ এমনকি হত্যাও করা হচ্ছে। ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে, এর সঙ্গে চলছে পৌরাণিক ঘটনাকে বিজ্ঞান বলে চালানোর চেষ্টা। একে প্রতিহত করতে হলে মতাদর্শের প্রতি দৃঢ় আস্থা প্রয়োজন। রাজ্য জুড়ে গণতন্ত্রের ওপর যে আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে, সরকারী কর্মচারী থেকে গোটা রাজ্যের

শহীদ মিনার অভিমুখে কর্মচারীদের মিছিল

পুঁজিবাদ তার স্বার্থেই শ্রমজীবী জনগণ তথা বামপন্থীদের পরাস্ত করার চেষ্টা করবে, একই সঙ্গে পুঁজিবাদ সঙ্কটে পড়লে তা থেকে পরিত্রাণের জন্য যে কোনো পথের আশ্রয় নিতে দ্বিধাবোধ করবে না। আমরা দেখেছি সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে পুঁজিবাদের রক্ষক সাম্রাজ্যবাদীরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছিল। যদিও ইতিহাস এটাই যে বিশ্ব যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয় ঘটে, রাইখস্ট্যাগে লাল পতাকা উড্ডীন করে সোভিয়েতের লাল ফৌজ। বর্তমানেও ২০০৮-এর মহামন্দার কারণে বিশ্বব্যাপী সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পেতে পুঁজিবাদ গোটা দেশের শ্রমজীবী মানুষের ওপর চরম আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, দেশ দখলের যুদ্ধের বদলে আজ চলছে দেশের অর্থনৈতিক বাজার দখলের লড়াই। এতে বাধাপ্রাপ্ত হলে বিভিন্ন দেশের সরকারের পতন ঘটাতেও তারা পিছপা হচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ পথে নামছেন। আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও শ্রমিক শ্রেণীর ওপর আক্রমণ তীব্র হচ্ছে, এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশের বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির চক্রান্ত যার মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষ বিশেষত মহিলা-কৃষক-শ্রমিক যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন এর বিরুদ্ধে লাল ঝাণ্ডাকে হাতিয়ার করে মতাদর্শে শাণিত হয়ে আগামীর আন্দোলনে আমাদের সামিল হতে হবে। রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে এবং শ্রমজীবী জনগণের ঐক্য বিনাশকারী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সকল শ্রমিক-কর্মচারীর ঐক্যবদ্ধ লড়াই-ই এ মুহূর্তে আমাদের প্রধান কর্তব্য। সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করতে গিয়ে সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য বলেন, সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, জাতপাতের বিভাজন ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে এবং রাজ্যের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে শ্রমজীবী মানুষের মহান ঐক্যকে আরও দৃঢ় করে আগামীর লড়াইতে আমাদের সামিল হতে হবে। এরপর কর্মচারী ভবন থেকে উপস্থিত কর্মচারীরা মিছিল করে শহীদ মিনার অভিমুখে রওনা হন।

সমিতিগুলির উদ্যোগে মে দিবস প্রতিপালন ঃ

এ বছর ১ মে দিবস যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করলো **পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী সমিতি** (W.B.M.O.A)। সমিতির নিজস্ব ভবন রাজেন্দ্র ভবনে। শতাধিক কর্মচারীর উপস্থিতিতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ঐ দিনের কর্মসূচীর সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সভাপতি দেবলা মুখার্জী। পরবর্তীতে শহীদ বেদীতে মাল্যদান পর্ব সমাপ্ত হওয়ার পর মূল সভার কাজ শুরু হয়। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতিমণ্ডলী হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির সভাপতি দেবলা মুখার্জী এবং পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ভূমি সংস্কার সমিতির সভাপতি প্রদীপ বাগচী। সভার শুরুতেই সঙ্গীত পরিবেশন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির সাংস্কৃতিক টিম। পরবর্তীতে এই সভায় মে দিবসের প্রাসঙ্গিকতা ও বর্তমান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুখেন কুণ্ডু।

তাৎক্ষণিক বক্তব্য প্রতিযোগিতা

মে-দিবসের তাৎক্ষণিক বক্তৃতা কর্মসূচী প্রতিপালন হয়। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় সঞ্চালকের ভূমিকা প্রতিপালন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির যুগ্ম সম্পাদক দেবাশিষ মিত্র। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক পাত্র। এই প্রতিযোগিতায় ২জন মহিলা সমেত মোট ১৫ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। সময় নির্ধারিত ছিল ৫ মিনিট করে। তাৎক্ষণিক বক্তৃতায় যে বিষয়গুলি উঠে আসে তা হলো—অসংগঠিত কর্মচারী, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা, পঞ্চায়েত, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, মিডিয়া প্রভৃতি। প্রত্যেক প্রতিযোগীই অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে বিষয়গুলি উত্থাপিত করেন। পরিশেষে বিচারকদ্বয়ের প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন অনিন্দ্য চ্যাটার্জী, দ্বিতীয় স্থান ইন্দ্রনীল সান্যাল, তৃতীয় স্থানে যুগ্মভাবে প্রণব কর এবং বন্দনা বিশ্বাস। পরিশেষে প্রতিযোগীদের অভিনন্দন জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং অশোক পাত্র। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার স্বরূপ বই তুলে দেয়া হয়। এরপর সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতিদ্বয়ের পক্ষে দেবলা মুখার্জী।

ওয়েস্ট বেঙ্গল নন টেকনিক্যাল এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় দপ্তরে মে দিবস উদ্‌যাপিত হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন অন্যতম সহ-সভাপতি মানস কুমার বড়ুয়া। সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শান্তনু ভট্টাচার্য।

❑ ❑ ❑

ওয়েস্ট বেঙ্গল লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্ট এ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১ মে উদযাপিত হয়। রক্ত পতাকা উত্তোলন করেন সমিতির প্রবীণ নেতৃত্ব তথা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রবীণ নেতৃত্ব পুলককান্তি বিশ্বাস। শহীদদের স্মরণ করে ১ মে-র তাৎপর্য ব্যাখা করেন পুলক কান্তি বিশ্বাস, সুব্রত মৈত্র, মৃণাল কান্তি দাস সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কোষাধ্যক্ষ লিটন পাণ্ডে।

❑ ❑ ❑

পশ্চিমবঙ্গ ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টস এ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর দীনেন্দ্র ভবনে পালিত হল মে দিবস। সমিতির সভাপতি ফাল্গুনী সরকার রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। সভাপতি, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ও সমিতির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুবিমল ব্যানার্জী সহ উপস্থিত সকলে শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন।

সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক সুব্রত গুহ ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু ঘোষ।

❑ ❑ ❑

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরে মে দিবস প্রতিপালিত হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক রেবা মুখার্জী। সভায় প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক গীতা দে। মূল আলোচক ছিলেন পিকু ব্রহ্ম। সভাপতিত্ব করেন রেবা মুখার্জী।

❑ ❑ ❑

কলকাতার সমিতি ভবনে অবস্থিত সংগঠনগুলির যৌথ উদ্যোগে মে দিবস প্রতিপালিত হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন উত্তম দাস। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন **পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের** সাধারণ সম্পাদক প্রণব কর। মূল আলোচক ছিলেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য আশিস ভট্টাচার্য। সভায় সভাপতিত্ব করেন উত্তম দাস। ❑

দেবাশীষ রায়

সংগ্রামের ময়দানে থেকেই আটচল্লিশে পদার্পণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সফলভাবে মোকাবিলা করছে সংগ্রামী হাতিয়ার। কর্মচারীদের চেতনায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ যাতে প্রবেশ না করতে পারে তার জন্য সংগ্রামী হাতিয়ার সদা সচেষ্ট। এই সময় সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী প্রচার একটা বড় জায়গা নিচ্ছে পত্রিকার পাতায় খুব স্বাভাবিকভাবেই। এখনও অবধি সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামে ভূমিকা পালনে সফল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। কিন্তু আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। এই সংগ্রাম আরও ব্যাপকতর করার ক্ষেত্রে যোগ্য সহায়ক ভূমিকা আগামী দিনে পালন করবে সংগ্রামী হাতিয়ার।

এই সামগ্রিক লড়াই লড়তে মুখপত্রকে প্রধানত সাহায্য করবেন পত্রিকার গ্রাহকবৃন্দ। বিগত বছরগুলিতে রাজ্য প্রশাসনে নিয়োগ বন্ধ এবং ব্যাপকহারে কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের ফলে প্রশাসনে স্থায়ী কর্মচারীদের সংখ্যা কমেছে। এর প্রভাব কিছুটা পড়েছে মুখপত্রের গ্রাহকভুক্তির ক্ষেত্রেও। তবে রাজ্য সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ধারাবাহিক আপসহীন সংগ্রাম স্থায়ী-অস্থায়ী সমস্ত অংশকেই প্রভাবিত করছে। এর প্রভাব অন্তর্ভুক্ত সমিতির কারও কারও সদস্য বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ইতিবাচক অবস্থাকে সংগ্রামী হাতিয়ারের গ্রাহক বৃদ্ধি করার কাজে ব্যবহার করতে হবে। ২০১৮-১৯ গ্রাহকবর্ষে প্রথম লক্ষ্য হোক সকল অনুগামীকে মুখপত্রের গ্রাহকে পরিণত করা। জেলা-অঞ্চলে গ্রাহকভুক্তি বৃদ্ধির সুযোগ যতটা আছে সম্পূর্ণ কাজে লাগাতে হবে।

আমাদের গ্রাহক সংখ্যার একটা বড় অংশ ত্রিপুরার কর্মচারীরা। এটা আমাদের গর্ব যে অন্য রাজ্যেও সংগ্রামী হাতিয়ারের চাহিদা রয়েছে। ত্রিপুরার কর্মচারীদের লাল সেলাম। ওখানকার নেতা-কর্মীদের প্রয়াসকে অভিনন্দন জানিয়ে ছোট করবো না। এই প্রয়াস যাতে এবারও অক্ষুণ্ণ থাকে এই কামনা থাকল। ত্রিপুরায় সম্প্রতি সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতায় আসার পর গণতান্ত্রিক শক্তি শুধু নয়, রাজ্য কর্মচারীরাও ব্যাপকভাবে আক্রান্ত। তবে জনগণের লড়াই জারি আছে। সংগ্রামী হাতিয়ারও ত্রিপুরার কর্মচারীদের এই সংগ্রামের শরিক। শরিক এই রাজ্যের কর্মচারীরাও। ত্রিপুরার কর্মচারী-জনগণের সংগ্রাম অন্ধকারকে সরিয়ে দিয়ে আলোর দিশা দেখাবে এই প্রত্যয় আমাদের আছে।

সবশেষে কিছু আত্মসমালোচনা। এই সমালোচনা আগামী দিনে আরও ত্রুটিমুক্ত হওয়ার জন্য। সকল গ্রাহককে এখনও পারিনি পাঠকে পরিণত করতে আমরা। এই দায় যৌথভাবে সংগঠন এবং মুখপত্রের। আগামী দিনে একে কেন্দ্র করে কর্মসূচীর পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। পত্রিকা বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় স্তর থেকে ব্লক স্তর পর্যন্ত কিছু দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে। নতুন গ্রাহকবর্ষে এই ত্রুটি কাটিয়ে তোলার শপথ আমাদের নিতেই হবে। পত্রিকার প্রকাশনার ক্ষেত্রেও অনেক উন্নতির অবকাশ রয়েছে। এই ত্রুটি-দুর্বলতাগুলি কাটাতেই হবে।

সংগ্রামী হাতিয়ার ২০১৮-১৯ গ্রাহকবর্ষে আটচল্লিশে পা দেবে। আর দু'বছর পরেই পত্রিকার সুবর্ণ জয়ন্তী। নতুন গ্রাহকবর্ষে আমাদের অঙ্গীকার হোক এটাই যে সংগ্রামী হাতিয়ার তার ঐতিহ্য অনুযায়ী কাজ করে যাবে। কর্মচারীদের সাথে সংগ্রামী হাতিয়ারের যে সখ্যতা তৈরি হয়েছে তাকে আরও গভীরে নিয়ে যেতে হবে। পত্রিকা পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য আমরা আর পাঁচটা পত্রিকার মতো মশলা ব্যবহার করতে পারব না। পোস্টট্রুথের মগজ ধোলাই প্রক্রিয়ায় পাঠকদের নিমজ্জিত করতেও পারব না। আমাদের পত্রিকাকে পাঠকের কাছে নিয়ে যেতে হবে কর্মচারীদের প্রতি এবং সর্বোপরি মতাদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থেকেই। দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর ধরে এভাবেই কর্মচারীদের আপনজন হয়ে উঠেছে সংগ্রামী হাতিয়ার। এই পথে চলার অঙ্গীকার করেই আমাদের ২০১৮-১৯ গ্রাহকভুক্তি অভিযানে নামতে হবে। ❑

মানস কুমার বড়ুয়া

দৃষ্টি আকর্ষণ

২০১৮-১৯ গ্রাহক বর্ষে সংগ্রামী হাতিয়ার ও এমপ্লয়িজ ফোরামের গ্রাহক সংগ্রহের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে নির্দিষ্ট তথ্য কেন্দ্রীয় দপ্তরে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

......

মে-জুন ২০১৮-র বেতন থেকে নির্ধারিত হারে সংগঠন-তহবিল সংগ্রহ অভিযানকে সফল করুন — *কেন্দ্রীয় কমিটি*

নির্বাচনী কর্মীদের নিরাপত্তার দাবী জানিয়ে রাজ্যপাল ও নির্বাচন কমিশনকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পত্র

সমীপে,
মহামান্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল,
রাজভবন,
কলকাতা-৭০০০০১

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আমরা মনে করি, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, রাজ্যের ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে ব্যাপক দুষ্কৃতিমূলক কার্যকলাপ শুরু হয়েছে এবং ফলস্বরূপ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, যে এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়েছে। এমন কি বিভিন্ন ব্লক অফিস/নির্বাচনী অফিসগুলিতে কর্মরত রাজ্য সরকারী কর্মচারীরাও এই আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছেন না।

আপনি নিশ্চয়ই আরও জানেন যে, অতীতে নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রশ্নে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ভূমিকা নির্বাচন কমিশন দ্বারাও প্রশংসিত হয়েছিল।

কিন্তু বর্তমান সময়ে কয়েকটি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নির্বাচনী আধিকারিকগণ ভোটকর্মী নিয়োগের প্রশ্নে অস্বচ্ছ পদ্ধতি অবলম্বন করছেন। স্পষ্ট করে বলতে হলে বলা যায়, বিশেষ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রতি অনুগতদেরই ভোটকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হচ্ছে।

গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্মচারী ও একাংশের আধিকারিক আক্রান্ত হচ্ছেন। এমন কি বিভিন্ন নির্বাচনী দপ্তরগুলিতে তাঁদের সমাজবিরোধীদের হুমকি ও চাপের মুখে কাজ করতে হচ্ছে। এর ফলে তাঁদের পরিবারের অভ্যন্তরে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনরকম নিরাপত্তা ও সাহায্য না পাওয়ার ফলে, নির্বাচনী কাজে যুক্ত কর্মীরা ভয়, নিরাপত্তাহীনতা ও হতাশার শিকার। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে কর্মচারীদের মানসিকতায় নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ঘটতে বাধ্য।

তাই প্রতিবন্ধকতাহীন ও গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচনী কার্য পরিচালনার জন্য এবং নির্বাচনের কাজে যুক্ত কর্মীদের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে, আপনার কাছে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

অধিকন্তু সমগ্র বিষয়গুলি বিস্তারিত আকারে আপনার সহৃদয় বিবেচনার জন্য, আমাদের সময় দেবেন এই আশা রাখছি।

শ্রদ্ধাসহ
বিনীত
বিজয়শঙ্কর সিংহ
(সাধারণ সম্পাদক)

পত্র নং-কো-অর্ডি-৩১/১৮
তারিখ- ০৩/০৫/২০১৮

মাননীয় রাজ্য নির্বাচন কমিশনার
পশ্চিমবঙ্গ
মহাশয়,

আপনাকে গত ১৩ এপ্রিল, ২০১৮ পত্রের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে ব্যাপক সন্ত্রাস ও অস্থিরতার ফলে কর্মচারীরা নির্বাচনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গিয়ে রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীদের দ্বারা নৃশংসভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। আর পরবর্তী সময়ে তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মচারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নির্বাচনের কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এমতাবস্থায় কর্মচারী ও তার পরিবারের মধ্যে এক গভীর আতঙ্ক ও ভয়ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে রাজ্যে এইরকম ভয়াবহ অস্থিরতা ও নৈরাজ্য চলার ফলে ও জেলায় সেক্টরগুলি ও বুথগুলিতে নির্বাচনের কাজ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করার প্রয়োজনে প্রশাসনের কাছ থেকে কোনোরূপ নির্ভরতা বা প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় কর্মচারী সমাজে ও তাদের পরিবারের মধ্যে ভয়ানক এক ভীতি ও হতাশার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে।

রাজ্যের পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠু ও নির্ভয়ে পরিচালনার জন্য নির্বাচনী কাজে যুক্ত সর্বস্তরের কর্মচারীদের প্রশাসনিক নিরাপত্তা প্রদানসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুনরায় আপনার কাছে অনুরোধ করছি। পাশাপাশি, এই বিষয়ে কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ভয়ভীতি কাটাতে আমরা আপনার সাথে আলোচনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছি।

আশা করি এই পরিস্থিতিতে উপরোক্ত বিষয়টির সর্বোচ্চ গুরুত্ব উপলব্ধি করে আপনি সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

ধন্যবাদসহ,

ভবদীয়,
বিজয়শঙ্কর সিংহ
(সাধারণ সম্পাদক)

ষোড়শ জাতীয় সম্মেলন

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের সাথে সংগ্রামী হাতিয়ারের সাক্ষাৎকার

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ষোড়শ জাতীয় সম্মেলনের তৃতীয় দিনে টিফিন বিরতির সময় সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার পক্ষ থেকে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ, যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, পত্রিকা সম্পাদক সুমিত ভট্টাচার্য, পত্রিকা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য অশোক রায়, সুব্রত কুমার গুহ ও আশীষ মিত্র অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষে সম্পাদক এম আমবারাসু ও তামিলনাড়ু রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃত্ব কে রঘুরাজন উপস্থিত ছিলেন।

হাতিয়ার ঃ অভ্যর্থনা কমিটি কবে গঠিত হয়েছিল?

অভ্যর্থনা কমিটি ঃ গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালে এই কমিটি গঠিত হয়েছিল।

হাতিয়ার ঃ অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য সংখ্যা কত?

অভ্যর্থনা কমিটি ঃ ৩৪৫জন সদস্য নিয়ে অভ্যর্থনা কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয়। ৭৪টি অন্তর্ভুক্ত কর্মচারী সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদকরা এই অভ্যর্থনা কমিটিতে যুক্ত। এছাড়াও ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, সি আই টি ইউ, সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, সারা ভারত গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, রেলওয়ে এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, স্কুল টিচার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া, এবং সেক্রেটারিয়েট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের প্রতিনিধিরাও এই অভ্যর্থনা কমিটিতে যুক্ত ছিলেন।

হাতিয়ার ঃ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়?

অভ্যর্থনা কমিটি ঃ সম্মেলন উপলক্ষে প্রতিটি সদস্যর কাছ থেকে ১০০ টাকা করে চাঁদা সংগৃহীত হয়েছে। বাড়তি কোনো অর্থ সংগ্রহ করা হয়নি। উদ্যোক্তা তামিলনাড়ু গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ ১৪ হাজার, ফলে ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়েছে।

হাতিয়ার ঃ জাতীয় সম্মেলনে আনুমানিক খরচের পরিমাণ কত?

অভ্যর্থনা কমিটি ঃ আলোচ্য সময়কাল পর্যন্ত ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। শেষে আরো কিছু খরচ হতে পারে।

হাতিয়ার ঃ এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা কত?

অভ্যর্থনা কমিটি ঃ ৫০ জন মহিলাসহ মোট ১৫০জন কর্মী-নেতৃত্ব এই সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যরাও বিভিন্ন উপসমিতিতে বিভক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন।

হাতিয়ার ঃ প্রতিনিধিদের জন্য বিভিন্ন ধরনের খাবারের ব্যবস্থা আপনারা করেছেন। সমগ্র বিষয়টা কীভাবে সম্পাদিত হচ্ছে?

অভ্যর্থনা কমিটি ঃ কোনো সবজি বাজার থেকে কেনা হয় নি। অভ্যর্থনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০০ একর জমি ৯০ দিনের জন্য লিজ নিয়ে সংগঠনের হর্টিকালচারের কর্মীরা নিজেরাই বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেছেন। এই চাষে সম্পূর্ণই জৈব সার ব্যবহার করা হয়েছে যাতে কোনো খাবার খেয়ে প্রতিনিধিদের শারিরীক সমস্যা দেখা না দেয়। একটি জেলা কমিটি ৪০০ কেজি মাংস পাঠিয়েছে ও মাছ, ডিম বিভিন্ন জেলা কমিটি প্রেরণ করেছে প্রতিনিধিদের জন্য।

হাতিয়ার ঃ সম্মেলনের প্রচারের জন্য কী কী প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে?

অভ্যর্থনা কমিটি ঃ ৩৩ টা জেলা ও ২৪২টা ব্লক/তালুক-এ ১৫ মার্চ, ২০১৮ থেকে ১৫ দিনের প্রচার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যানার, ফ্লেক্স, দেওয়াল লিখন, স্টিকার ও দেড় লক্ষ প্রচার পত্র বিলি করা হয়েছে। ১০ হাজার কর্মচারী প্রকাশ্য সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন। আগামী মে মাসের ৮ তারিখে সংগঠনের নিজস্ব দাবি দাওয়াকে কেন্দ্র করে বিধানসভা অভিযানের কর্মসূচী রয়েছে। ঐ দিন ১ লক্ষ কর্মচারীকে উপস্থিত করানোর উদ্যোগ রয়েছে। তিনি জানান, তামিলনাড়ুর কর্মচারীদের মহার্ঘভাতা বকেয়া নেই। নতুন বেতন কমিশনও কার্যকরী হয়েছে। বেতন কমিশনের একুশ মাসের এরিয়ার, বেতন বৈষম্য নিরসন, নয়া পেনশন স্কীম বাতিল করে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা চালু করা, চুক্তিপ্রথায় নিয়োজিত কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতনের দাবি সহ বিভিন্ন দাবিতে এই বিধানসভা অভিযান সংগঠিত হবে।

হাতিয়ার ঃ এই সম্মেলনকে সফল করতে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কী?

অভ্যর্থনা কমিটি ঃ এই রাজ্যে প্রকৃত অর্থে কোনো সরকার নেই। সমস্ত কর্মকাণ্ড রাজ্যের আমলারাই পরিচালনা করছে। আমলাদের পক্ষ থেকে সাহায্য, সহযোগিতা পাওয়া গেছে। □

সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকা সত্ত্বেও কর্ণাটকে শপথ নিল বিজেপি মন্ত্রিসভা

অঙ্কের হিসেবে জলের মতো পরিষ্কার, সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই বিজেপির। এক-আধজন নয়। গরিষ্ঠতার চেয়ে তাদের কম আছে জোট তবেই পৌঁছানো যাবে ম্যাজিক ফিগার ১১২-তে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ সাতসকালেই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ইয়েদুরাপ্পা। বৃহস্পতিবার রাজভবনে সকাল ৯টা নাগাদ তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করালেন রাজ্যপাল। সংসদবিষয়কমন্ত্রী অনন্ত কুমার বলেন, "বৃহত্তম দলকে সরকার গড়ার জন্য ডেকেছেন রাজ্যপাল। আস্থাভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দেব আমরা।"

গতকাল মাঝরাতে কংগ্রেসের হয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি। সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রারের কাছে আবেদন জমা দেন তিনি। আবেদন নিয়ে রাতেই প্রধান বিচারপতির বাসভবনে পৌঁছন অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার। রাত ১.৪৫ মিনিটে সুপ্রিম কোর্টে শুরু হয় শুনানি। শুনানিতে কেন্দ্রের তরফে হাজির ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল একে বেণুগোপাল। বিজেপির তরফে ছিলেন মুকুল রোহতগি। দু'পক্ষের সওয়াল শোনার পর ইয়েদুরাপ্পার শপথগ্রহণে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেন প্রধান বিচারপতি। তবে ১৫ ও ১৬ মে ইয়েদুরাপ্পা সরকার গঠনের দাবি জানিয়ে যে চিঠি রাজ্যপালকে দিয়েছিলেন তা জমা দিতে বলেছে আদালত। ঐ চিঠির সারমর্ম খতিয়ে দেখতে চায় কোর্ট। শুক্রবার সকাল ১০.৩০ মিনিটে ফের এই মামলাটির শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

২২৪ আসনের কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসাবে ১০৪টি আসন পেয়েছে বিজেপি। ২টি আসনে নির্বাচন না হওয়ায় সেরাজ্যে এখন সরকার গঠনের জন্য দরকার ১১২ জন বিধায়কের সমর্থন। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে ৮টি আসন দূরেই থামতে হয় বিজেপিকে। উল্টো দিকে সেরাজ্যে কংগ্রেস পেয়েছে ৭৮টি আসন। জেডিএস পেয়েছে ৩৮টি আসন। ফল বেরোতেই জেডিএসকে নিঃশর্ত সমর্থন ঘোষণা করে কংগ্রেস। যদিও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে বিজেপিকেই প্রথমে সরকার গঠনের আমন্ত্রণ জানান রাজ্যপাল বজুভাই বালা।

কট্টর বিজেপি নেতা রাজ্যপাল বাজুভাই বালা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একান্ত আস্থাভাজন। তারই কারণে তিনি কংগ্রেস ও জেডিএসের ন্যায্য ও সুস্পষ্ট গরিষ্ঠতার সংখ্যাসহ সরকার গঠনের দাবিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সরকার গড়তে ডাকলেন বিজেপি নেতা ইয়েদুরাপ্পাকে। রাজ্যপাল তাঁকে গরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য সময় দিয়েছেন টানা ১৫ দিন। যা এবার বিজেপির বিধায়ক কেনার জন্য উঠেপড়ে লাগার পক্ষে যথেষ্ট। ইতিমধ্যে শোনা যাচ্ছে বিজেপি বিধায়ক পিছু দাম হাঁকিয়েছে ১০০ কোটি টাকা। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA | **State Co-ordination Committee** | **Regd. No. : 18484/71**
SANGRAMI HATIAR | 46th Year, 12th Issue, April '18 | Price : Two Rupees

মে দিবসে
শহীদ মিনারে কেন্দ্রীয় জমায়েত

প্রতি বছরের মতো এই বছরও মে দিবসের বিকেল বেলায় বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও ফেডারেশন সমূহের উদ্যোগে শহীদ মিনারে শ্রমিক কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন সি আই টি ইউ-র রাজ্য সভাপতি সুভাষ মুখার্জী। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, "তৃণমূল সরকার নানাভাবে শ্রমিকশ্রেণী, খেটে খাওয়া মানুষের অর্জিত অধিকার ও আন্দোলনের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনছে। কখনো ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার আইনের হুমকি দিয়ে, কখনো প্রতিবাদ-বিক্ষোভ জমায়েতের অধিকার হরণ করে। প্রশাসনিকভাবে বেতন কাটা, সার্ভিসের দিন কমিয়ে দেওয়া, পুলিশ ও শাসক দলের পেশি শক্তিকে লেলিয়ে দিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের দাবি আদায়ের আন্দোলন স্তব্ধ করার অবিরত প্রচেষ্টা চলছে। মুখে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেও মমতা সরকার আসলে মোদির নীতিকে উৎসাহিত করছে।......"

এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু, এ আই টি ইউ সি-র বাসুদেব গুপ্ত, টি ইউ সি সি-র প্রবীর ব্যানার্জ্জী, ইউ টি ইউ সি-র দীপক সাহা, এ আই সি সি টি ইউ-র বাসুদেব বসু, এইচ এম এসের মহম্মদ আলি, এ আই টি ইউ সি-র দিলীপ ভট্টাচার্য, বি ই এফ আই-র জয়দেব দাশগুপ্ত, ১২ই জুলাই কমিটির সমীর ভট্টাচার্য, মার্কেন্টাইল ফেডারেশনের বলেন্দ্রনাথ বসু, ইস্টার্ন রেলওয়েমেন্স ইউনিয়নের শুভ্র ব্যানার্জ্জী, বি এস এন এলের অনিমেষ মিত্র প্রমুখ। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এ আই সি সি টি ইউ-র অতনু চক্রবর্তী।

এদিন কলকাতার তিনটি স্থান— মহম্মদ আলি পার্ক, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, ভিক্টোরিয়া হাউস থেকে শ্রমিক কর্মচারীদের তিনটি মিছিলের মাধ্যমে কয়েক হাজার শ্রমজীবী মানুষ সমাবেশে হাজির হন। □

দেশে দেশে মে-দিবস

১৬ মে ১৯৬৮, ৮ দফা জরুরী দাবীতে সংগঠিত হয়েছিল রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের প্রথম ধর্মঘট। সেই ঐতিহাসিক ধর্মঘটের পঞ্চাশ বছর পূর্তি

উপলক্ষে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে কলকাতার মৌলালী যুব কেন্দ্রে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ

নেতৃত্ব ও সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক প্রণব চট্টোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শংকর সিংহ। সভা উপলক্ষে কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। ঐ কক্ষে সকলের স্থান সঙ্কুলান হয়নি। পরবর্তী পর্বে জেলায় জেলায় এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হবে। (বিস্তারিত সংবাদ পরবর্তী সংখ্যায়)

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ষোড়শ জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধিবৃন্দ

পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০১৮
নির্বাচনের প্রহসন হাস্যকর ফলাফল

গত ১৪ মে ২০১৮ এ রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য একে আদৌ নির্বাচন বলা যায় কি? প্রায় মাসাধিককাল ধরে গ্রাম বাংলায় যা ঘটল, তাকে যদি সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করতে হয়, তাহলে বলা যায় 'গণতন্ত্রের বহ্নোৎসব'। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচনের যে গুরুত্ব তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রক্রিয়াটা এ রাজ্যে শুরু হয়েছিল ২০১১-র পর থেকে। গায়ের জোরে, ভয় দেখিয়ে ভোট ছিনতাই করাটাই বর্তমানে এ রাজ্যের দস্তুর। ফলে ঘুরে ফিরে যখনই নির্বাচন আসে সাধারণ ভোটাররাও আশঙ্কায় ভুগতে থাকেন, এবারে নিজের ভোট নিজেই দিতে পারবো তো?

কিন্তু এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যা ঘটল, তা গত কয়েক বছরের সমস্ত নজিরকে ছাপিয়ে গেছে। শুরুটা হয়েছিল নির্বাচনের দিন ঘোষণার কয়েকদিন আগেই। যখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটি প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর দলের পঞ্চায়েতে ১০০ শতাংশ আসনেই জয়ের প্রয়োজন। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সময় থেকে এই পৃথিবীতে কার্যকরী হয়েছে, তখন থেকে আজ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক নেতাই এমন আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেননি। কারণ দ্বি-দলীয় বা বহুদলীয় যে ধরনের ব্যবস্থাই হোক না কেন সবক'টি আসনে একটি দলই জিতবে এটা কখনো হতে পারে না। অথচ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাসনা তেমনই। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের ফলে তাঁর পারিষদবর্গ প্রবল উৎসাহে আসরে নেমে পড়ে। এবং মনোনয়ন পত্র দাখিলের কাজ শুরু হওয়া মাত্রই বোঝা যায় যে নেত্রীর নির্দেশকে কার্যকরী করতে তারা কতটা মরিয়া। বিডিও এবং এসডিও অফিসগুলিতে, যেখানে মনোনয়ন দাখিলের কাজ হবার কথা সেখানে শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাহারা দিতে শুরু করে, যাতে করে বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বামপন্থীরা মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে না পারে। যাঁরা সাহসে ভর করে মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে গেছেন, শাসকদলের গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে তাঁদের রক্তাক্ত হতে হয়েছে। এমনকি অশীতিপর নেতাও বাদ যাননি। মহিলা প্রার্থীদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। এত কিছু পরেও, যারা মাথা নোয়াননি এবং নির্বাচনের ময়দানে ছিলেন, তাদের এবং পরিবারবর্গকে বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে নাম প্রত্যাহারের জন্য। প্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও এলাকায় থেকে প্রচার করতে পারেননি অনেকেই। এমনকি পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছিল যে নিরাপত্তার প্রশ্নে আদালতকেও আশঙ্কা প্রকাশ করতে দেখা গেছে। নির্বাচনের দিন প্রতিটি জেলার অধিকাংশ বুথই ছিল গুণ্ডাবাহিনীর দখলে। সাধারণ মানুষ বুথ পর্যন্ত পৌঁছোতেই পারেননি। যাঁরা কোনোরকমে পৌঁছেছিলেন তাদের বলা হয়েছে, আপনাদের ভোট হয়ে গেছে। পুলিশ বাহিনী যাদের ওপর দায়িত্ব ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষার, তারা কার্যত শাসকদলের ক্যাডারের ভূমিকা পালন করেছেন। পুলিশের চোখের সামনে অবাধে ছাপ্পা ভোট, ব্যালট পত্র জ্বালানো অথবা জলে ফেলে দেওয়া, সবকিছুই ঘটেছে নির্বিঘ্নে। পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা ছিল কেবলমাত্র দর্শকের। একই কথা প্রযোজ্য নির্বাচন কমিশনার সম্পর্কেও। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদে থাকা সত্ত্বেও, নির্বাচন কমিশনারের ভূমিকা সারা দেশ থেকে ধিকৃত হয়েছে।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, গণনার দিন বিভিন্ন গণনা কেন্দ্রে শাসক দলের গুণ্ডাবাহিনী নতুন করে ব্যালট পেপারে ছাপ দেয়। বিশেষ করে যে সমস্ত কেন্দ্রে এত কিছুর পরেও বিরোধীদের জয়ের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। গণনার দিন নতুন করে ছাপ্পা ভোট, সারা পৃথিবীতে সম্ভবত এর কোনো নজির নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সব থেকে বীভৎস ও নারকীয় ঘটনাটি ঘটে কাকদ্বীপে। যেখানে বামপন্থী হবার অপরাধে এক দম্পতিকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। পাশবিক এই হত্যাকাণ্ড রাজ্যের মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। □

গ্রাম পঞ্চায়েত

ভোট হওয়া আসন	৩১,৮১৪
তৃণমূল	২০,৭৩৯
বিজেপি	৫,৫৭৯
বামফ্রন্ট	১,৬৭০
কংগ্রেস	১,০১৯
নির্দল	১,৭৭৯

পঞ্চায়েত সমিতি

ভোট হওয়া আসন	৬,১২৫
তৃণমূল	৩,৮০০
বিজেপি	৫১১
বামফ্রন্ট	৮৩
কংগ্রেস	৮৪
নির্দল	৮৪

জেলা পরিষদ

ভোট হওয়া আসন	৬২২
তৃণমূল	২২০
বিজেপি	
বামফ্রন্ট	
কংগ্রেস	
নির্দল	

*পত্রিকা প্রকাশের সময় পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।